প্রতীক্ষা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশ : আগস্ট ১৯৬২

প্রকাশক : সানন্দশ্রী ভট্টাচার্য
পোঃ—বালি-দুর্গাপুর

মুদ্রক : গীতা প্রিন্টার্স,
২১, পঞ্চানন ঘোষ লেন,
কলকাতা-৯।

প্রচ্ছদ : দোলা বসুরায়

সুবীর রায়চৌধুরী
স্নেহভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই

দেবভূমি কামারপুকুর
মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র
আবর্তে বিদ্যাসাগর
সুখ দাও ভগবান
অনলপ্রভ বিদ্যাসাগর
গুদোমে গুমখুন
প্রভু জগন্নাথ
ঘ্যাচাং ফু
মরার পর নামের আগে অটোমেটিক হরি
কাঁধে কম্বল পায়ে চপ্পল
নীল আকাশে লাল ঘুড়ি
ঝড়
দিদি
খেয়াল
নিয়তি
বেশ আছি রসে বশে
যা হয়, তাই হয়
মামা এক মামা দুই মামা তিন চার
আরোহী
কালের কাণ্ডারী
গিরিশচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশচন্দ্র
শ্রীচরণকমলে
মুখোমুখি শ্রীরামকৃষ্ণ
দাদুর কীর্তি
গাঙচিল
কিচির মিচির
সাপে আর নেউলে
রাত বারোটা
কাটলেট
কিশোর রচনাসম্ভার ১ম, ২য়, ৩য়
হেডস্যারের কাণ্ড
বড়মামার কীর্তি
থ্রি-এক্স
বাঘমারি
সপ্তকাণ্ড
সাত টাকা বারো আনা
হাসি কান্না চুনী পান্না
পুরনো সেই দিনের কথা
গাধা
সুখ ১ম, ২য়, ৩য়
আন্দামান : ভারতের শেষ ভূখণ্ড
বাঙালিবাবু
উৎপাতের ধন চিৎপাতে
হাসির আড়ালে
নির্বাচিত রম্যরচনা সমগ্র
১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ
১৩টি উপন্যাস (একত্রে)

প্রতীক্ষা
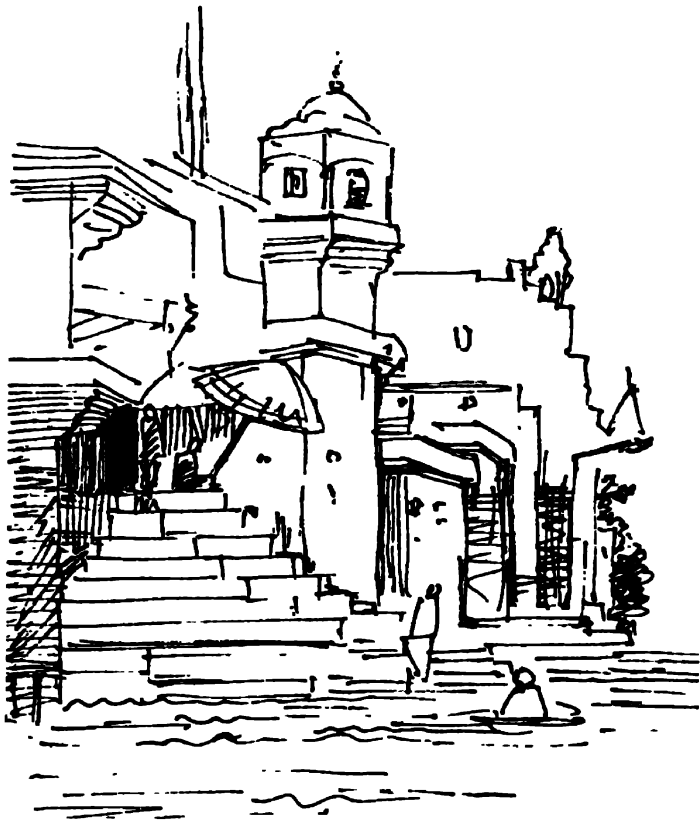
সাবেক কালের পুরোনো পুরোনো চেহারাটা এ-পাড়ায় এখনো বজায় আছে। ঈশ্বরের কৃপা। যা কিছু প্রগতি, আধুনিকতা, হুড়ুম-দুড়ুম, হটরপটর, সব ওই দিক দিয়ে হড়হড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে। এ-পাড়ায় এখনো বেশ কিছু কাকাবাবু ও জ্যাঠামশাই-এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। অবহেলিত, বিপন্ন নন। স্বমহিমায় বিরাজিত। মুখে সুখ সুখ হাসি। গায়ে ধুনো ধুনো গন্ধ। এখনো মাথায় জবাকুসুম মাখেন। স্নানের সময় গামছা ব্যবহার করেন। ধুতি পরেন। গোল গলা হাফ হাতা গেঞ্জি। সাবেক কালের মানুষের খাঁটি ঘি-দুধ খাওয়া টান টান দেহত্বক। পবিত্র মানুষদের এই রকমই হয়। মনে দুশ্চিন্তা নেই। উৎকণ্ঠা নেই। সোজা কথাকে বাঁকা করেন না। ভেতরে কোনো প্যাঁচ নেই। কখনো কোনো সমস্যা এলে হাহা করে হেসে সাবানের বুদবুদের মতো উড়িয়ে দেন।

রাস্তাটা হল স্ট্রিট। খুব চওড়াও নয়, খুব সরুও নয়। ভ্যাঁ ভোঁ গাড়ির উৎপাত কম। দুটো বাড়িতে মোটর সাইকেল ঢুকেছে। কালেভদ্রে ভট্‌ভট্ করে। যখন বাইরে চাকরি করা ছেলেরা ফিরে আসে কয়েকদিনের ছুটিতে। তখন পাড়াটা বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। মায়েরা সব রান্নাঘরে ঢুকে পড়েন। খ্যাচর খ্যাচর শব্দ। যাঁ কল কল। বাতাসে সুগন্ধ। কর্তাদের বাজার করার ধুম। এক কর্তা বাজার থেকে ফিরছেন। মাথায় ফুরফুরে পাকা চুল। গায়ে আদ্দির ফতুয়া। ধুতিটা একটু তুলে পরা! ধবধবে পায়ে রাদুর চপ্‌পল। ব্যাগে নানা রকমের ডালপালা, যেন 'হ্যান্ড বাগান'। আর এক কর্তা দেখে বললেন, 'ছাগলটা এসেছে বুঝি!'

'আর বলিস না ভাই, এটা খাব, ওটা খাব করে আমার ব্রাহ্মণীর মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। বাড়িটা শষ্পসম্পদে ভরে উঠেছে। হুকুম হয়েছিল এঁচড়ের কোপ্তা খাবেন। অতি কষ্টে একটি কাঁঠালশিশু জোগাড় করেছি। উগ্র দাম।'

'মৎস্য?'

'তিনি সম্প্রতি আমেরিকান হয়েছেন। কম্‌প্লিট ভেজ।'

কথা থেমে গেল, কী একটা মনে পড়েছে, 'যাঃ।'

'কী হল রে?'

'লাউ। লাউ নিতে ভুলে গেছি।'

'আজ ছেড়ে দে।'

'হবে না রে ভাই। আধখানা লাউয়ের রস রোজ খেতেই হবে। সাধু রামদেবের অ্যাডভাইস!'

'আর বল না ভাই, আমাদের বাড়িতে গেলে দেখবি সকলেরই পেট নাচছে আর নাকে ফোঁস-ফোঁস। যেন নাকে মশা ঢুকেছে। বলা নেই কওয়া নেই মেঝেতে সটান পা ছড়িয়ে দিয়ে পায়ের পাতা দুটো পতপত করে এপাশে-ওপাশে নাড়াতে লাগল।'

'আমি ভাই এখন লম্বা লাউয়ের খোঁজে আবার বাজারমুখো হচ্ছি।'

'লাউ-এর রস খেলে কী হয়?'

'মোটা রোগা হয়।'

'আর রোগা মোটা হবে কী ভাবে?'

'হবে না। দেহের একটা আড়া থাকে। আমাদের কেদার। সেদিন একটা অটোয় উঠেছিল। গাড়িটা দেবে গেল। ব্রেক ডাউন। পুরো মেরামতির খরচ দিতে হল। ওর বউ ওকে আমজাদ বলে ডাকে।'

'ওর বউই বা কম যায় কীসে। নাম ছিল টুনটুনি, এখন হিন্দি সিনেমার টুনটুন। আগরতলার প্লেনে উঠেছিল। দুজনে বাঁ দিকে বসেছিল। আকাশে ওঠার প্লেনটা বাঁ দিকে কেতরে গেল। পাইলট এসে দুজনকে দু'দিকে সরিয়ে বসালেন। প্লেন সোজা হল।'

সন্ধেবেলা কেদারবাবুর বৈঠকখানায় প্রাচীনদের আড্ডা বসে। কেদার জেঠু পুলিশ বিভাগের ভারি অফিসার ছিলেন। ঠোঁটের ওপর বহুত জমাটি গোঁফ। গোল মুখ একটুও টোস খায়নি। এই বয়েসেও ডাম্বেল, বারবেল ভাঁজেন। বিছানায় বালিশের দু'পাশে দুটো দশ পাউন্ডের ডাম্বেল শুইয়ে রাখেন। উদ্দেশ্য, মাঝরাতে হঠাৎ যদি মৃত্যু আসে, ডাম্বেল ভাঁজতে ভাঁজতে ওপারে যাবেন। ভগবানের ভুল ধারণাটা ভাঙবে—বাঙালিরা বড়ো দুর্বল, পেটরোগা। কেদারজেঠুর খুব ইচ্ছে ছিল এভারেস্টের চূড়ায় উঠবেন। সে

আর হয়ে ওঠেনি। হঠাৎ জেঠিমা মারা গেলেন। পান মুখে হাহা করে হাসছিলেন। হঠাৎ শ্বাসনালিতে সুপুরি ঢুকে গেল। ফিনিশ। কলেজ থেকে ফিরে এলুম। পাড়াটা থমথম করছে। মণিকাকু রকে বসে আছেন একা। ভারি বিষণ্ণ মুখে। আমাকে বললেন, 'ভেরি স্যাড ডেথ। কেদারটা আমার দলে ঢুকল।' মণিকাকুর স্ত্রীও মারা গেছেন মাত্র তিন দিনের জ্বরে।

কেদারজেঠু বলিষ্ঠ, সাহসী মানুষ। চোর-ডাকাত ধরেছেন। রাইফেল, রিভলভার চালিয়েছেন। একবার মাঝরাতে একটা চোরকে কার্নিশ থেকে ঠ্যাং ধরে নামিয়ে একটা বাঘা কুকুরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি জড়িয়ে রাস্তায় ফেলে রেখেছিলেন। ঘটনাটা ঘটেছিল উত্তরপাড়ায়। পরে বলেছিলেন, চোরটা ভেরি ক্লেভার। কুকুরের সঙ্গে জড়াজড়ি অবস্থায় সারা রাত নানা কায়দায় ঘেউ ঘেউ করে ডাকছিল। সেই চোর পল্টু এখন কেদারজেঠুর ডান হাত। জেঠিমা পল্টুকে সবরকম রান্না শিখিয়েছিলেন। জেঠিমার মৃত্যুতে অশৌচ পালন করেছিল। শ্রাদ্ধ করেছিল। সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। কোনো তীর্থে যায়নি। সুন্দর বলে, 'কেদার তীর্থে পড়ে আছি, অন্য তীর্থে আর কী প্রয়োজন!' কেদারজেঠু তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। করেনি। বলে, সংসারও যা জেলখানাও তাই।

এই পাড়াটার শেষ মাথায় একটা ভাঙা বাড়ি আছে। বেশ বড়ো। সাত শরিকে মামলা চলছে। ও চলছে, চলবে। কাবেরী বলেছিল, 'এঁড়ে বাছুরের মতো তোরা ঘুরিস, হ্যা-হ্যা-হ্যা—একটা ভালো কিছু করতে ইচ্ছে করে না!'

কথাটা সুব্রতর মনে খুব ধরল। ধরার কারণটা আমরা জানি। আমরাও উৎসাহিত হলুম যে কারণে—সেই একই কারণ—কাবেরী। এ-পাড়ার সবচেয়ে স্মার্ট, সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। খোকন আর্ট কলেজে থার্ড ইয়ার। যখনই কোনো মেয়ে আঁকে, সেটা কাবেরী হয়ে যায়। কাবেরী জানে না, সে কত ছেলের হৃদয়-ঘুলঘুলিতে পাখি হয়ে আছে। সত্যর কলমে কবিতা ভালো আসে। ভালো ভালো পত্রিকায় সাত-আটটা ছাপা হয়েছে। সাঁইত্রিশটা চিঠি এসেছে। বাদুড়বাগানে টুইটি, সোনাপুরের শর্মিষ্ঠা সরাসরি প্রেম নিবেদন করেছে, কবিতায়। 'তোমার নিকেল চোখ স্টেনলেস ছুরি/ হৃদয়ে অভ্রের চিকিমিকি হাসি। কবি! তুমি আমার বাইশের আকাশে প্রেমে ফুলঝুরি!'

কেদারজেঠুর কাছে কাবেরীর প্রস্তাবটা পেশ করা হল। শ্যামলকাকু

উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'শি ইজ এ গ্রেট লেডি। ক্লিওপেট্রা।'

কেদারজেঠু বললেন, 'বয়েসটা খেয়াল রেখ। এরা নাচছে নাচুক, তুমি নেচো না।'

আমরা ধরা পড়ে গেছি। কেদারজেঠু পুলিশের বড়কর্তা ছিলেন। কত অপরাধীর পেটের কথা টেনে টেনে বের করতেন। সুশান্ত বললে, 'আমরা নাচিনি জেঠু। সব ব্যাপারে আপনি আমাদের লিডার, তাই তো আপনার কাছে এসেছি।'

'নাচনি, তবে নাচব নাচব করছ। কী বলছে কাবেরী নদী!'

'ওই পোড়ো বাড়িটা অধিগ্রহণ করে সমাজসেবামূলক একটা কিছু যদি করা যায়! দেশের-দশের উপকার।'

'কী বলেছে? হ্যা-হ্যা করে ঘুরে না বেড়িয়ে—নাঃ, এই মেয়েটার মধ্যে 'মেটাল' আছে। মা আছে। ওকে একবার নিয়ে এস আমার কাছে।'

'এখুনি আনতে পারি!' বললে সূর্য।

'কী ভাবে আনবে?'

'হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে।'

'রামছাগল! হাঁটিয়ে আনবে না তো কি পালকি চাপিয়ে আনবে? তাকে পাবে কোথায়?'

'এই সময় আমাদের বাড়িতে আসে মায়ের কাছে রান্না শিখতে।'

'বল কী! নাঃ, এই মেয়েটার মধ্যে জীবনবোধ আছে। তোমার মায়ের হাতের রান্না আমি খেয়েছি। তুলনাহীন। নিয়ে এস তাকে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে কাবেরী এল হাসতে হাসতে। প্রায় ছ'ফুট। পেছনে বিনুনি ঝুলছে। কোমর ছাপিয়ে। ফালা ফালা, চেরা চেরা চোখ, যেন ছুরির ফলা। উঁচু টিকালো নাক। দুধে আলতা গায়ের রং। একসঙ্গে পুরোটা দেখার সাহস আমাদের নেই। যেন রূপের আগুন। মরে যেতে ইচ্ছে করে।

কেদারজেঠু দেখেই বয়স্যদের বললেন—'আফগান। দ্রৌপদীর রক্ত।'

তারককাকু মাঝে মাঝে জাতিস্মর হয়ে যান। পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা মনে পড়ে যায়।

তারককাকু বললেন, 'একে আমি আগে দেখেছি।'

'কোথায় দেখেছ?'

'সময়টা সকাল। হাওদা লাগানো হাতির পিঠে। কনৌজেশ্বরী। মুক্তেশ্বর

মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার গুরু চাণক্য।'

কেদারজেঠু বললেন, 'ওষুধ চলছে তো। ছেড় না। ক্রমশই বাড়ছে।'

কাবেরী ইতিমধ্যে কেদারজেঠুর পাশে খালি চেয়ারে বসে পড়েছে। বসে বললে, 'জমজমাট আড্ডা।'

পূর্ব পূর্ব জন্মের দরজা খুলে গেছে। তারকাকুকে থামানো যাচ্ছে না। তিনি বলেই চলেছেন, 'মুক্তেশ্বর মন্দির পাহাড়ের খাঁজে। আড়াইশো সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। চাণক্যের হাঁটুতে বাত। রোজ রাতে মন্দাকিনী বাঘের চর্বি মালিশ করত। একদিন আলেকজান্ডার এসে হাজির। দাবা খেলবে। সেদিন যুদ্ধের অফ ডে। রাতে থাকবে। মুগের ডালের খিচুড়ি খাবে। মন্দাকিনী খিচুড়ি রাঁধতে জানে না। শেষ পর্যন্ত আমাকেই রাঁধতে হল। আলেকজান্ডার প্রায় এক হাঁড়ি খেয়ে ফেললে। চাণক্য বললেন এক বোতল জোয়ানের আরক গিলিয়ে দাও! বীর আলেকজান্ডার সুপুরির মতো এত বড় একটা হিরে দিলেন।'

'সেটা কোথায়?'

'সে তো কত জন্ম আগের কথা। এইটুকু মনে আছে লছমনঝোলার ঝোলা ছিঁড়ে নদীতে পড়ে গেলুম। স্রোতের টানে হরিদ্বারে। হিরেটা মহাশোলের পেটে। তারপর কী হল জানি না। এইটুকু জানি সেই হিরে মানিকতলার মাছের বাজারে এসেছিল। সেখান থেকে চলে গেল হায়দারাবাদের নিজাম প্যালেসে।'

কেদারজেঠু বললেন, 'এর হাত থেকে বাঁচার কী উপায়?'

'মরে না গেলে বাঁচার উপায় নেই।'

'না, না, নিজে বাঁচার জন্যে মৃত্যু কামনা করব না। সূর্য কোথায়?'

'একটু বাইরে গেছে।'

'সিগারেট?'

'সিগারেট খায় না।'

'তবে?'

'আলুর চপ খেতে গেছে। এই সময় রোজ ও দুটো আলুর চপ খায়। নেশার মতো।'

এই সময় সূর্য ঘরে ঢুকল।

কেদারজেঠু বললেন, 'চপ খাওয়া হল!'

'চপ? চপ খাব কেন?'

'এই যে কে যেন বললে। যাক, তুমি আর কাবেরী পাশাপাশি দাঁড়াও দেখি। হাইট মাপব।'

দুজনে দাঁড়াল।

'কাঁধে কাঁদ ঠেকাও। বাঃ, সেম হাইট। বেশ মানিয়েছে। সামনের ফাল্গুনে। তোমরা কী বলো?'

সবাই একবাক্যে সমর্থন করলেন। বিধান একটু চুপসে গেল। ও খুব প্রেমে পড়তে চায়, কেউ ওর প্রেমে পড়ে না। উত্তম-সুচিত্রার বই এলে দশ-বারোবার দেখবেই। কেদারজেঠু জিজ্ঞেস করলেন, 'সূর্য! তোমার বাবা বিলেত থেকে ফিরছেন কবে?'

'রবিবার।'

'ওর চেয়ে ওর মাকেই আমার বেশি পছন্দ। মা বলেই তো ডাকি।'

'ব্যস্, এগিয়েই আছ। এই ফাল্গুনে তল্পি-তল্পা নিয়ে ঢুকে পড়। আমরা বুড়োরা খুব আনন্দ করব। সানাই বসাব। আলোর মালা ঝোলাব। আগের দিন ভিয়েন হবে। দরবেশ, কমলাভোগ। রান্নার জন্যে গঙ্গার ধারের অপু ঠাকুর আসবে হাতা-খুন্তি-ঝাঁঝরি নিয়ে। বউবাজার থেকে আসবে খোয়া ক্ষীর। মোল্লারচকের দই। নতুন বাজার থেকে নতুন ঝুড়ি আসবে। গরম গরম লুচি মাথার ওপর দিয়ে চিলের মতো উড়ে যাবে ফোঁটা ফোঁটা ঘি। কিন্তু আমি তো অতদিন বাঁচব না।'

এই একটা কথায় সবাই কেমন থমকে গেলেন। কাবেরীর মুখটা কেমন হয়ে গেল।

'বাঁচবেন না কেন?'

'আমার একটা ভয়ংকর অসুখ হয়েছে।'

'কী অসুখ?'

'বোন-ম্যারো ক্যানসার। আমার হাড়ের খাঁচাটা প্যাঁকাটির মতো পটপট করে ভাঙতে থাকবে। কুছ পরোয়া নেই। ওপর থেকে দেখব।'

কাবেরী উঠে দাঁড়াল, 'আমি বিয়ে করব না, কোনো দিন করব না। এত মৃত্যু এত মৃত্যু! আমি সন্ন্যাসিনী হব। হিমালয়ের দিকে চলে যাব। জেঠু! আমি যে তোমাকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলুম। সেই ক্ষীরপাই নদীর ধারের

আমাদের বাংলো। বাবা বসে আছেন সাহেব সেজে। এস. ডি. ও। উর্দি পরা সরকারি লোকেরা আসছে যাচ্ছে। লোহার জিপ গাড়ি। শক্ত নিরেট। যখন চলে ফ্যাট্ ফ্যাট্ ত্রিপলের শব্দ। বন্দুকধারী পুলিশ। জেলখানার পাঁচিল। কবি 'জেলকাকু'। বাগানের পেয়ারা গাছের ডালে চড়ে আমার মা পেয়ারা পাড়ছে। ফুল ফুল ফ্রক পরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। পায়ের কাছে দুটো খরগোশ কুচকুচ ঘাস খাচ্ছে।

'সেবারের বর্ষায় ক্ষীরপাইতে বন্যা হল। আমাদের বাংলোর হাতায় এক কোমর জল। জল ঢুকল বসার ঘরে। বাবার বইয়ের র‍্যাকের একতলাটা জলের তলায় চলে গেল। আমাদের ছোটোদের কাগজের নৌকো ভেসে পড়ল বাগানের জলে। রাজা, রাজপুত্তুর, রাজকন্যা। সত্যেনবাবু সাঁতার কাটতে কাটতে এসে জানিয়ে গেলেন নৌকো নামানো হয়েছে। পশ্চিম পাড়ায় গঙ্গাধর রোডের শেষে দাঁড়ালে বুক কেঁপে যাবে। শুধু জল আর জল। বাড়ির চালাগুলো টুপির মতো ভাসছে। যারা পেরেছে তারা সব গাছের ডালে ভিজে কাপড়ের মতো ঝুলছে। মা একটা, নৌকো জোগাড় করে তিন হাঁড়ি খিচুড়ি আর আমাকে নিয়ে পথে ভেসে পড়ল। সব পথই নদী হয়ে গেছে। মায়েরা বুকের কাছে বাচ্চাদের জাপটে ধরে শুকনো জায়গার সন্ধানে চলেছে। ঠান্ডা বাতাসে ঠোঁট নীল হয়ে গেছে। পাড়ার রাস্তায় নৌকোটাকে কী বিশাল দেখাচ্ছে। এর উঠোন, তার গোয়াল, মুদির দোকান, সব জলে জল। কোথায় শুরু, কোথায় শেষ বোঝার উপায় নেই। দমকা বাতাসে নৌকোর গলুইয়ের তেরপল ভটাস ভটাস শব্দ করছে। একটা কাঠবেড়ালী টপাস করে লাফিয়ে পড়ল মায়ের কোলে। তার ছোট্ট হাত দুটো দিয়ে মায়ের বুক আঁকড়ে ধরে রইল। সেই দিন বুঝতে পেরেছিলুম—পৃথিবীর মা একটাই। আশ্রয়ের নাম মা, সাহসের নাম মা, শান্তির নাম মা, স্নেহের নাম মা, ভালোবাসার নাম মা, মৃত্যুর নাম মা।'

কাবেরীর এইসব কথা শুনে ঘরের সবাই স্তম্ভিত। কী বলছে মেয়েটা! কেদারজেঠু বললেন, 'ক্যানসেল। এ মেয়ের বিয়ে ক্যানসেল। সূর্য ইজ নো ম্যাচ। সূর্য এ মেয়ের নখের যুগ্যি নয়। এ অনেক হাই অলটিটিউডে উঠে গেছে।'

কেশবকাকু বললেন, 'মেয়েদের বিয়ে করতেই হয়, তা-না হলে বদ

লোকেরা শহরে নিয়ে গিয়ে বাইজি করে দেয়। আমি সিনেমায় দেখেছি।'

'বেশ করেছ। এখন চুপ করে বস। মূর্খরা যত কম কথা বলে ততই ভালো।'

'এই দেখ তুমি একজনের কথা মনে করিয়ে দিলে। সে আমার বউ। যদ্দিন বেঁচে ছিল, রোজ অন্তত বার দশেক এই কথাটা বলত। অথচ আমি ডবল এম. এ। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বড়ো কলেজে অধ্যাপনা করেছি।'

'বেশ করেছ। বউরা ঠিক ধরতে পারে'।

'কী ধরতে পারে?'

'বিদ্যে থাকে পেটে আর বুদ্ধি থাকে মগজে। পণ্ডিতরা বেশির ভাগই বোকা হয়। ঘোড়া জানে না সে কেমন। যে পিঠে চড়ে সে-ই বুঝতে পারে ঘোড়াটা কোন্ জাতের।'

জাতিস্মর কাকু বললেন, 'কী আশ্চর্য। পৃথ্বীরাজ আমাকে ঠিক এই কথাটাই বলেছিল।

কেদারজেঠু বললেন, 'মরেছে, এ আবার কোন্ জন্মে চলে গেল?'

'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ।'

'আরে ধুর! সে তো সিনেমা। উৎপল দত্তের ফাটাফাটি অভিনয়।'

'আমি বলছি পৃথ্বীরাজ চৌহানের কথা। আমি তার মোসাহেব ছিলুম। ছেলেটা খালি যুদ্ধ করত। সময় পেলেই আমাকে ডেকে পাঠাত। আমার বউ আমাকে শিখিয়ে দিত—বেশ করে মোসাহেবি করে ছোটোখাটো একটা রাজ্য আদায় করে নিতে পারছ না?'

'সংযুক্তাকে দেখেছ?'

'দেখিনি আবার! তোমরাও দেখছ।'

'দেখছি মানে!'

'এই ঘরেই বসে আছে। সংযুক্তাই এ-জন্মে কাবেরী।'

কেদারজেঠু কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আর তো সহ্য করা যাচ্ছে না। আমরা এখানেই শেষ করি।'

কাবেরীর সঙ্গে সূর্যের বিয়ে হচ্ছে না শুনে আমাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ খুশি হল। কারও কারও একটু মেয়েবাতিক থাকে, কিছু করার নেই। সত্য বলেছিল, প্রেম মানুষকে বড় করে, শিল্পী করে, বিজ্ঞানী করে, সাহিত্যিক করে। হতে পারে। আমাদের পাড়াটা একটু অন্য রকমের।

দুই

বর্ষা এসে গেছে জোর। আমাদের বাড়ির পেছন দিকে একটা মাঝারি সাইজের বাগান। সেটাকে টপকালেই গঙ্গা। আমার ঠাকুরদা খুঁজে খুঁজে জায়গাটা বের করেছিলেন। আমি তাকে দেখিনি। ছবিতেই পরিচয়। হাতলঅলা বড়ো একটা চেয়ারে বসে আছেন। হাতে ছড়ি। ছোটো ছোটো চুল। ধুতির ওপর কোট। গোল চশমা। চওড়া গোঁফ। গম্ভীর মুখ। প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অনেক গল্প শুনেছি। নামকরা শিক্ষক ছিলেন।

আমাদের বাড়ির পেছন দিয়ে একটা রাস্তা ঘুরে চলে গেছে কাবেরীদের বাড়ির দিকে। কাঠের গেট। মাধবীলতা। যথেষ্ট বড়লোকের মেয়ে। কাবেরীর দাদা ডাক্তার। নাম আছে। পসার আছে। গাড়ি আছে। দারোয়ান আছে। দোতলায় ঝুল-বারান্দা। জায়গাটা বেশ ছায়া ছায়া। কাবেরীর দাদা ব্যাচেলার। বিয়ে করবেন না। আমাদের কেদারজেঠুর সঙ্গে কী রকম একটা সম্পর্ক আছে। জেঠু বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। হেসে বলেছিলেন, আত্মহত্যা করার কোনো কারণ ঘটেনি। প্রেসার নর্মাল, সুগার নেই। হার্ট, লাংস, কিডনি, লিভার ঠিক আছে। শুলেই ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্ন দেখি না। কবিতা পড়ি না। ঝাল খেতে ভালোবাসি। মিষ্টি ছুঁই না। এই বাড়িটার নামই হয়ে গেছে 'বিবাহ-বিরোধী ভবন'।

এই দিকটায় একা একা আসতে আমার ভালো লাগে। গঙ্গার ধারে এক বৈষ্ণব সাধকের সমাধি আছে। অনেকদিন সংস্কার হয়নি। প্রাচীন একটা বকুল গাছ। ছোট্ট একটা কুঠিয়া। জরাজীর্ণ অবস্থা। দুজন বৈষ্ণবী সেখানে বাস করেন। গলায় তুলসীর মালা। সব সময় হরিনাম করেন। কাবেরী রোজ এঁদের তরি-তরকারি, চাল-ডাল দিয়ে যায়। অসুখবিসুখ হলে ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করেন। ওষুধ-বিষুধ দিয়ে যান। বছরে একদিন ছোটোখাটো একটা উৎসব হয়। অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন। আমরা সবাই চাঁদা তুলে নরনারায়ণ সেবা করি। ওপার থেকে কীর্তনের দল আসে। বকুলের সময় ঝরা বকুলে সমাধি ছেয়ে যায়।

কেন জানি না সংসারে আমার একটা বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাচ্ছি না। এত প্রতিযোগিতা, লড়াই। স্বার্থের ঢাকঢোল। প্রাচীন

পরিবারগুলো সব ছইছত্রাকার হয়ে যাচ্ছে। আমার শেষ আকর্ষণ আমার জ্যাঠামশাই চলে যাওয়ার পর জীবন বিষাদ। তাঁর কত কল্পনা ছিল। কত আনন্দ তৈরি করতে পারতেন। ঋষির মতো চেহারা। বিরাট একটা যৌথ পরিবারের হেড। গ্রামের যারা কলকাতার কলেজে লেখাপড়া করতে আসত তারা সব আমাদের বাড়িতে আশ্রয় পেত। থাকা, খাওয়া, হাতখরচ। জামা-কাপড়, বই-খাতা। হুগলির বিষয়-সম্পত্তি সব বিক্রি হয়ে গেল। আশ্রিতরা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরে পড়ল। আমাদের যৌথ পরিবার ফর্দাফাঁই। সবাই জ্যাঠামশাইকে দুষতে লাগলেন। একমাত্র আমার বাবা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মেজদা যা করেছে ঠিক করেছে।' জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমাদের গ্রামের দশটা ছেলে ব্রিলিয়েন্ট হয়েছে। কেউ বিজ্ঞানী, কেউ ডাক্তার। কেউ আমেরিকায়, কেউ বিলেতে। সব আমাদের ছেলে।'

মুখের ওপর কেউ কিছু বলত না। আড়ালে সব ঠোঁট উলটে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত। তখনই বুঝতে পারতুম পরিবারে ফাটল ধরছে। যাক গে, মরুক গে। আমার অত ভাবনা-চিন্তার দরকার নেই। বাবা বলতেন, নিজের কাজ করে যাও—Make hay while Sun shines। কলেজে পড়তে পড়তেই মনে হয়েছিল, যে যা হয় হোক, আমি লেখক হব। মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা লিখব। শ্যামল আমার ইচ্ছের কথা শুনে বলেছিল, অত সহজ নয়। লিখলেই লেখক হওয়া যায় না।

হয় তো তাই। আমাদের এই বাড়িটায় একতলা, দোতলা মিলিয়ে কত ঘর। একসময় গমগম করত। প্রত্যেকটি ঘরে এক একটা ছোট গল্প। সব মিলিয়ে একটা উপন্যাস। একশোটা বছর। হুগলি থেকে আমার পিতামহ একবস্ত্রে চলে এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়েস মাত্র ন' বছর। গৃহত্যাগ করেছিলেন কেন? ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ ঝাপসা। আমার বাবা, জ্যাঠামশাইও ঠিক ঠিক জানতেন না। আমার সেলফ মেড ঠাকুরদা এই রকম বলতেন, কবর খুঁড়ে অতীতের কঙ্কাল তোলার চেষ্টা না করে বর্তমানটাকে বড়ো করো। আমার অতীত ঘাঁটার সময় নেই। আমি মরা কাটা ডাক্তার নই।

আমাদের পরিবার যে স্কুলে লেখাপড়া করেছে, সেই নামী স্কুলের নামী প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁর কোনো অতীত থাকবে না, এ কি হতে পারে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের ছবি দিয়ে একটা 'ফটো গ্যালারি' আছে

স্কুলে। চারুচন্দ্রের অয়েল পেন্টিং আছে সেই গ্যালারিতে। ওই একটিই ছবি। দ্বিতীয় আর কোনো ছবি নেই। ওই ছবিরই কপি আমাদের বাড়িতে। পিতামহ কোনোরকম আত্মপ্রচার, বাবুগিরি পছন্দ করতেন না। বলতেন, দুর্বল মগজের লোকেরাই এইসব করে। বলিষ্ঠ মনের বলিষ্ঠ মানুষ হও। নিজের 'ক্যারেকটার সার্টিফিকেট' নিজে লেখো। দুখচেটে, তেলচিটে, দারিদ্দির আমার যেমন অসহ্য, ঠিক সেই রকম অসহ্য 'ফোতো কাপ্তেনি'। এই পরিবারে বড়ো হতে হতে এই আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। অভ্যাস করার চেষ্টা করেছি। কেউকেটা হতে পারিনি ঠিকই, তবে বেশ একটা তৃপ্তি বোধ করি। জীবনের পিছল মেঝেতে পা হড়কে যায়নি। যাদের সঙ্গে মেলামেশা করি, ওপর ওপর। নিজেকে হারিয়ে ফেলি না। কিন্তু সমস্যা একটাই, আমার পিতামহের সেই কালটা আর নেই। দ্রুত সব বদলে যাচ্ছে। 'চরিত্র' শব্দটা আছে, ভূতের মতো। ছায়া আছে কায়া নেই। হিসেব করে দেখলাম জেনারেল অ্যাসেমব্লিজে আমার পিতামহ স্বামীজির সহপাঠী ছিলেন। ভাবলেও শরীরে কাঁটা দেয়। তারকেশ্বরে গিয়ে তাঁর ভিটে খুঁজি। শুনেছি সেই তালুকের ওপর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে কল্পনা করি, এই জায়গায় ছিল রান্নাঘর। এইখানে গোয়াল। এইখানে ছিল বৈঠকখানা। কেউ কেউ ভাবেন আত্মহত্যা করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি বুঝি। একদিন রেলের ইঞ্জিনিয়ার পতাকা উড়িয়ে ট্রলি করে যাচ্ছিলেন। কিছুটা গিয়ে ট্রলিটা থামল। পিছিয়ে এল আমার কাছে। ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, দাঁড়িয়ে কেন? বললুম, পিতামহের ভিটে খুঁজছি। কী বুঝলেন কী জানি। সঙ্গের সহকারীকে বললেন, মাথার গোলমাল আছে। সহকারী বললেন, গাঁজা খায়। ট্রলিটা চলে গেল। সন্ধে নামছে। একটা দোকানে এসে চুপ করে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। ভৈরবী চা খাচ্ছেন। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। ডান হাতে ভাঁড়, বাঁ হাত ত্রিশূল। সুন্দরী। কালো কোঁকড়া চুল। জটা নয়। চওড়া লাল পাড় গেরুয়া। গলায় গোটা গোটা রুদ্রাক্ষের মালা। চোখ দুটো ভারি সুন্দর। ভৈরবীকে বেশ মনে ধরে গেল। কোনো উপায় নেই।

ভাঁড়টা ডাব্বায় ফেলে ভৈরবী আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বুকটা ধক্ করে উঠল। ভৈরবী বললেন, 'দুঃখু কীসের! সব কি পাওয়া যায়? কেউ নেই তো কী হয়েছে? মা তো আছেন! জগতের মা!'

ভৈরবী হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন। মনে হল, একটা টান আমাকে টানছে। দোকান থেকে বেরিয়ে ভৈরবীর পিছু নিয়েছি। রাত। অন্ধকার। মাঝে মাঝে আলো। ভৈরবী ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, 'পেছন পেছন আসছ কেন? মন চঞ্চল হয়েছে বুঝি?'

বললুম, 'জানি না। কেউ টানছে।'

'কেউটা হল আমি। আমি টানছি।'

'সে বুঝেছি'।

'হাত ধরে তো টানিনি, তাহলে কী ধরে টেনেছি?'

সাহস করে বলেই ফেললুম,

'আমার ভালোলাগা।'

'ভালোলাগা আর ভালোবাসায় কী তফাত!'

'সে তো ভেবে দেখিনি।'

'তোমার তো ত্রিভুবনে কেউ নেই?'

'আছে হয়তো। আমিও খবর রাখি না, তারাও খবর রাখে না।'

'চলো।'

'কোথায়?'

'যেখানে নিয়ে যাব।'

পথে আর কোনো কথা হল না। প্রায় এক মাইল। ভৈরবী যখন হাঁটছে, লোহায় লোহায় ঠোকাঠুকি হলে যেরকম শব্দ হয় সেই রকম শব্দ হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'কীসের শব্দ?'

'আমার কোমরে বাঁধা আছে লোহার চেন। দুটো দিক দু'পাশে ঝুলছে, চলছি যখন দুলছে। ঠোকাঠুকি হলেই শব্দ হচ্ছে।'

'চেন কেন?'

'অন্ধকার, লোহা, কয়লা, গুহা—এইসব দিয়েই আমাদের মন তৈরি। অন্ধকার দিয়েই আমাদের মন তৈরি। অন্ধকার না থাকলে আলোর কথা কে ভাবত। লোহা না থাকলে তুলোর মতো নরম, এই কথাটা কে বুঝত! গুহার মতো নিরাপদ আশ্রয়! কয়লায় দুটোই পাবে—আগুন আর ছাই। ধোঁয়া হল অজ্ঞান। আমার কোমরের এই চেন আমার আত্মরক্ষার অস্ত্র।'

উঁচু রক। কুঠিয়ার মতো একটা ঘর। একটু দূরেই শ্মশান। ঢালু পাড়। নদী।

কুঠিয়ার দরজাটা খোলা মাত্রই অপূর্ব সুগন্ধ। বিরাট একটা পিলসুজে বড়ো একটা ঘিয়ের প্রদীপ। আশ্চর্য রকমের স্থির শিখা। ঘরের ভেতরটা গমগম করছে। ভেতরে আর একটা গুহার মতো ঘর। মোটা একটা গাছের গুঁড়ি সেই ঘরে নেমে এসেছে। একটি শিবলিঙ্গ। উঁচু ত্রিশূল। তিরতির জলের শব্দ। গুঁড়িটা বেল গাছের। ডালপালা সব বাইরের দিকে। গা ছমছম করছে। ভয় হচ্ছে। মনে হল বাঘ-ছাল। ভৈরবী বসলেন। পা দুটো টকটকে ফর্সা। কোমর থেকে চেনটা খুলে পাশে রাখলেন। ছম করে শব্দ হল।

প্রদীপের শিখা তিরতির করে কাঁপছে এইবার। ঘরে বাতাস এসেছে শবদাহের গন্ধ নিয়ে। দেয়ালে আমাদের ছায়া দুলছে। এ এক অদ্ভুত রাত। সাধিকা জিজ্ঞেস করলেন, 'ভয় করছে বুঝি? কীসের ভয়! থাকতে থাকতেই ভয় কেটে যাবে।'

'এখানে আমি থাকব না কি?'

'থাকবি না তো যাবি কোথায়? আমার কাছে কে থাকবে? আগের জন্মটা দেখবি না কি?' জাতিস্মর কাকুর কথা মনে হল। কাকু ইয়ারকি করেন। মজা করেন। একদিন গঙ্গার ধারে বৈষ্ণব সাধুর সমাধির কাছে আমার পাশে এসে বসেছিলেন। এ-কথা, সে-কথা, অনেক কথা হতে হতে কাকু হঠাৎ বললেন, আমাদের পাড়ায় দুজন দুঃখী, একজন আমি আর একজন তুমি। আমি তবু আনন্দ তৈরি করতে পারি, তুমি পার না। বাস্তবটাকে নিয়েই পড়ে আছ। বাস্তব বলে কিছু আছে না কি? আজ যা ঘটল কাল তা গল্প। একটু বিচার করলেই বুঝতে পারবে। আমি তাই গল্পেই থাকি।

সাধিকা ভৈরবীকে বললুম, 'পূর্বজন্ম আমি বিশ্বাস করি না।'

'কী বিশ্বাস করো?'

'এই জন্ম।'

'কতটা দেখেছ? কাল কি আমাকে দেখেছিলে?'

'না।'

'আজ তুমি দেখলে। এই দেখাটাকে বিশ্বাস করলে। তার মানে আগে দেখা তারপরে বিশ্বাস। আর একটা জগৎ আছে, যে জগতের ধারা হল আগে বিশ্বাস তারপর সেই বিশ্বাসটাকে দেখা। এইটাই হল সাধন জগৎ। এই জগতেই সাধকরা থাকেন। তুমি মনে করছ আমি আছি। সত্যিই কি আছি!'

আমার সামনে সত্যিই কেউ নেই। কিছুই নেই। ঝোপ-জঙ্গলে আচ্ছাদিত একটা টিবির ওপর পড়ে আছি। গভীর রাত। শীর্ণ নদী। চিতা জ্বলছে। গুমরে গুমরে আগুন উঠছে। বরফের মতো শীতল বাতাস।

উঠে বসে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতেই ফিরে এল সেই কুঠিয়া। বাঘছালের আসনে ভৈরবী। আরও উজ্জ্বল। প্রদীপ জ্বলছে। ঠোঁটের কোণে হাসি। 'কী হল? কলেজের বিদ্যায় কুলোল না। তাই তো?'

'হ্যাঁ, তাই। কিন্তু কেন আপনি আমাকে কৃপা করছেন?'

কোনো উত্তর এল না। বিশাল এবং চওড়া গঙ্গার ঘাট। সিঁড়ির পর সিঁড়ি। ওপর দিকে উঠে গেছে। এ-পাশে ও-পাশে ছায়া ছাতা। কত মানুষ। মন্ত্রপাঠ। কেউ জলে নামছে, কেউ ভিজে কাপড়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উপরে উঠে যাচ্ছে। কারও হাতে ঘটি, কারও হাতে কমণ্ডলু। এ তো বারাণসী। ওই তো আমি। ওই আমিটাকে কোন্ আমি দেখছে?

ভাবামাত্রই উত্তর এল, 'দৃষ্টি আছে দ্রষ্টা নেই। এ তোমার পূর্বজন্ম। শুধু দেখে যাও।' একটা বড়ো ছাতা খুলে আমি দাঁড়িয়ে আছি। ছাতা ধরে আছি এক বৃদ্ধের মাথায়। দুধ-সাদা বড়ো বড়ো চুল। দুধের সরের মতো গায়ের রং। চোখের পাতার ওঠা-পড়ায় দপদপ করছে আলো। পরনে লাল সিল্ক। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে দুজনে উঠছেন। পেছনে কে আসছেন, এ কে? এ যে ভৈরবী। মনে হওয়া মাত্রই ভৈরবী ঠোঁটে আঙুল রাখলেন, অর্থাৎ কথা কবে না।

এ কোন্ ঘাট? কেদারঘাট। পাথর বাঁধানো। ছাতার ছায়ার বাইরে অজস্র রোদ। পুড়ে যাওয়ার মতো গরম। আমার যে খুব আনন্দ হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার দুর্গের মতো একটা বাড়ির সামনে। রাজবাড়ি। দেউড়িতে পাহারা দিচ্ছে বন্দুকধারী দুজন সেপাই। সসম্ভ্রমে তারা পথ ছেড়ে দিল। ভেতরে একটা প্রাঙ্গণ। তিন মুখে তিনটে কামান। পর পর, অফিস ঘর। কর্মচারী অনেক। মহাবীরের মন্দির। পাশেই কুস্তির আখড়া। বিরাট একটা হলঘর। বেদ বিদ্যালয়। সমবেত কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণের শব্দ। একজন সাহেব আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। লাল টকটকে মুখ। একটা পালকি যাচ্ছে। কোথাও কেউ বন্দুক ছুড়ছে। ফট্‌ফট্ করে অনেক পায়রা উড়ে গেল। কেউ নেই। আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। সূর্য নেই। চাঁদ উঠেছে। সামনে

গভীর জঙ্গল। ভয় করছে। খুব ভয়। কাঁধে একটা হাত এসে পড়ল। গম্ভীর গলা। 'এতই যখন ভয় সাধু হলি কেন? ফিরে যা, ফিরে যা। তোর এ পথ নয়।'

ঠ্যাং ঠ্যাং করে ঘণ্টা বাজছে। কানে এল, 'ট্রেন আসছে, ট্রেন আসছে।'

চোখ মেলে তাকালুম। চোখের সামনে ভৈরবীর মুখ ঝুঁকে আছে। ভৈরবী কোথায়! এ যে কাবেরী। সুন্দর একটা ঘর। জানালায় নেটের পর্দা। পরিষ্কার, নরম বিছানা। ঢং ঢং করে ওয়াল ক্লক বাজছে। ঘোর তখনো কাটেনি। জিজ্ঞেস করলুম, 'ট্রেন এসে গেছে!'

মাথার দিকে বসে থাকা কেউ একজন বললেন, 'ট্রেন আর আসবে না। কাবেরী অন্য লাইনে ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

গলাটা খুব চেনা। বোধ হয় জাতিস্মরকাকু!

'আমি কোথায়?'

'কাবেরীর বাড়িতে!'

'কেন?'

'এই এক মাস পরে তোমার জ্ঞান ফিরল। ব্রেন ফিভার। কাবেরীর জন্যে বেঁচে গেলে বলেই মনে হচ্ছে।'

'জাতিস্মরকাকু?'

'বল।'

'এদিকে আসুন!'

পাশে এসে বসলেন, 'কী বলছ?

'কাশী থেকে এখানে এলুম কী করে?'

'আগে বল কাশী গেলে কী করে?

'তা তো জানি না।'

কাবেরী বললে, 'আর কথা নয়। সব কথা পরে হবে। এখন কমপ্লিট রেস্ট।'

জাতিস্মরকাকু বললেন, 'ঠিক ঠিক। সব কথা পরে। কেদারকে খবরটা দি।'

দুপুরবেলা ডাক্তারবাবু এসে সব দেখে বললেন, 'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, পাল্‌স নেই বলেই মনে হচ্ছে, তবু বেঁচে আছে। অবৈজ্ঞানিক

ব্যাপার, কী হয়েছিল তোমার? কিছু কি মনে পড়ে?'

অনেক কিছুই মনে পড়ছে। ছবির মতো। অবিশ্বাসীদের বলে লাভ নেই। আমার বিশ্বাস কাবেরী আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কাবেরীর পাল্‌স দেখলে দেখা যাবে, ডবল রেটে চলছে। বলে কী হবে? পাওয়ার ফেল করলে জেনারেটার চালানো হয়, তখন কানে আসে একটি শব্দ 'সুইচ-ওভার'। আমার প্রাণ এখন সুইচ-ওভারে চলছে। জেনারেটার—কাবেরী। কাবেরীকে সবাই কাবেরী বলে জানে। আমি তার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছি। কাবেরী নিজেই হয়তো জানে না।

বিকেলবেলা ঘর ভরে গেল। রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার কেদারজেঠু জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক কী হয়েছিল, মনে করতে পার? কেউ কি কিছু খাইয়ে দিয়েছিল?'

'না তো!'

আলমকাকু বললেন, 'কেউ জিন চেলে দিয়েছিল। তুমি কি কোনো টিবির ওপর বসেছিলে। পাশে শশ্মান, নদী!'

আশ্চর্য! আলমকাকু জানলেন কী করে!

কেদারজেঠু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এসব জানলে কী করে?'

'ভাগলপুরে আমার গুরু ছিলেন। এক ফকির। ভীষণ ক্ষমতা। আমি যখন ফরেস্ট অফিসার, আমাকে একবার বিচ্ছু কামড়েছিল। সাপে কামড়ালে যদিও বাঁচার সম্ভাবনা থাকে বিচ্ছু কামড়ালে আশা কম। মানুষ একটা ঘোরের মধ্যে চলে যায়। বিষ নিমেষে মাথায় চড়ে। সেই ঘোরের মধ্যে শুনছি দূর থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ এগিয়ে আসছে। তারপর আর জানি না। ফিরে এলুম।'

'ফিরে যে এসেছ সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'না, আমি ফিরিনি।'

'তাহলে কে ফিরল?'

'বিচ্ছু কামড়াবার আগে আমি ছিলুম অশোক চট্টোপাধ্যায়। বিচ্ছুর কামড়ের পর আলম। কুমকুম আলম। যখন জ্ঞান হল দেখলুম বটগাছের ছায়ায় সাহেবদের মতো ধবধবে সাদা একটা ঘোড়া। পায়ের কাছে ক'টা সাদা খরগোশ লুকোচুরি খেলছে। পিঠে একজোড়া কাঠবেড়ালী। আমার পাশে বসে আছেন রেশমের আলখাল্লা পরা এক ফকির। চন্দনের মতো গায়ের

রং। পোখরাজের মতো চোখ। খাড়া নাক। পনিরের মতো সাদা চুল দু'কাঁধে কাবলি বেড়ালের লেজের মতো লটরপটর করছে। পায়ে জরির জুতো। মণিমুক্তো সেট করা। পরে জানতে পারলুম, ইরানি ফকির। জিঞ্জিরার জঙ্গলে ক্যাম্প করেছেন। বিখ্যাত সুফি রুমির বংশধর। খলিল গিবরানের বংশের মেয়ে তাঁর ঠাকুমা। এই ঠাকুমা আবার ওয়ারেন হেস্টিংসের ক্ষত ভালো করেছিলেন। ডুয়েল লড়ার সময় এই ঠাকুমা তখন সুন্দরী যুবতী, পালকি চড়ে কালীঘাট মন্দির থেকে ফিরছিলেন। দেখলেন একটা মাঠে দু'জন সাহেব দু'পাশে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকছে। গোরা ব্যান্ড বাজছে। দুই সাহেবের হাতে দুটো পিস্তল। ঠাকুমা একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হচ্ছে?'

একজন বললেন, 'এই সাহেবটা রাত্রিবেলা বারান্দা টপকে এসে ওই সাহেবের বউয়ের ঘরে ঢুকত। একদিন ধরা পড়ে গেল। তাই ডুয়েল হচ্ছে। যে বাঁচবে বউ তার।'

হেস্টিংস জিতলেও একটা বুলেট হাত ছেঁচড়ে বেরিয়ে গিয়ে একটা কদম গাছের গুঁড়িতে ঢুকে গিয়েছিল। সেখান থেকে একমাস ধরে রস গড়িয়েছিল। আলিপুরের কবি কাহিনি লিখেছিলেন—'কদমের কান্না'। হেস্টিংস সাহেব খুশি হয়ে সেই কবিকে বিলেতে নিয়ে গিয়ে মেকলের কাছে ইংরিজি শিখিয়ে খ্রিস্টান করেছিলেন। ভারতে ফিরে আসার সময় জাহাজডুবি হয়ে মারা যান।

সেই ফকির আমাকে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জিপের পেছনে ভিজে ভিজে নেপিয়ার ঘাসের বিছানা। আমাকে চিত করে শোয়ানো হয়েছে। শরীরে কোনো পোশাক নেই। চোখ দুটো নীল হয়ে গেছে। কালো কালো ঘাম বেরোচ্ছে। ভেতরে যেন আগুন জ্বলছে। সাতদিন আমাকে মাটি মাখিয়ে ফেলে রাখা হল। এই সময় একটি মেয়ে, তার নাম আমিনা আমার ভীষণ সেবা করেছিল। কঙ্কাল হয়ে গিয়েছিলুম। সে-ই পাকা পটুয়ার মতো আমার দেহ পুনর্নির্মাণ করে দিলে। সেই আমিনার জন্যেই মুসলমান হলুম।

সেই সুফি সাধকের কাছে আমি জিন চালা শিখেছিলুম। অদৃশ্য ধনুকে অদৃশ্য ধীর। সুইস্। তির ছুটল। ঢুকে গেল। মানুষটা তখন হাতের মুঠোয়। জিন কন্ট্রোল সেন্টার থেকে তখন তাকে কন্ট্রোল করা হবে।'

কেদারজেঠু বললেন, 'শেষ হয়েছে?'

'শেষ! এই তো সবে শুরু।'

কাবেরী বললে, 'যথেষ্ট হয়েছে। এইবার সব উঠুন।'

কাবেরীর ব্যক্তিত্ব সকলকে ছাপিয়ে যায়। আমি শুয়ে শুয়ে অবাক হয়ে দেখি। কাবেরীর দাদা মস্ত বড় ডাক্তার। বিলেত থেকে পাশ করা; কিন্তু কোনো অহংকার নেই। অপূর্ব দেখতে। ডক্টর চ্যাটার্জি। ঘরে এলেন। মুখে উদ্ভাসিত হাসি। কাল শেষ রাত পর্যন্ত সেতার বাজিয়েছেন। মুস্তাক আলির শিষ্য। মেজাজি হাত। সেতার যেন কাঁদে। আমার মা সেতার বাজাতেন। বড় বনেদি ঘরের মেয়ে ছিলেন। আমার বাবা ভীষণ ভালোবাসতেন। মাকে উদ্দেশ করে ইংরিজিতে কবিতা লিখতেন। বাবা ভীষণ ভালো এস্রাজ বাজাতেন। আমার বাবা আর মায়ের সম্পর্ক দেখে সবাই বলতেন—Example Example। গোলাপ ভালোবাসতেন। খুব রসিক ছিলেন। কত রকমের গোলাপ ফুটত তাঁর গোলাপ বাগানে। আমার সামনেই মায়ের খোঁপায় গোলাপ গুঁজে দিয়ে আমাকেই জিজ্ঞেস করতেন, 'কেমন দেখাচ্ছে?' টেনিসন ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। শীতে আমরা পাহাড়ি জায়গায় বেড়াতে যেতুম। ঝরনার সামনে চেটালো পাথরে বাবার কাঁধে মাথা রেখে রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। আকাশ লাল করে সূর্য অস্ত যেত পাহাড়ের খাঁজে। চাপ চাপ অন্ধকার পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ত। কর্কশ প্যাঁচা। ভীষণ ভয় করত। ভিজে পাতার ঠান্ডা। ঝরনার শব্দ আরও প্রবল হত। এক সময় আমরা ফিরে যেতুম বন বাংলোয়। কাঠের মেঝে, সিঁড়ি, দোতলা। এদিকে ওদিকে লণ্ঠন দুলছে। গরম চা। মা গলায় মাফলার জড়িয়ে দিতেন। বাপরে কী সুন্দরী! বাবা বলতেন, ভগবান তোমাকে নিজের হাতে তৈরি করেছেন। খোলাখুলি সব বলতেন। বলেছিলেন, তোর জন্যেও এইরকম একটা বউ আনব। খুব যত্নে রাখবি। আমার লজ্জা করত। মা আমাকে কোলের কাছে টেনে নিতেন। সিল্কের শাড়ি, বিলিতি সেন্টের গন্ধ।

নিজেকেই নিজে বলি, অতীত ভেবে কী হবে! মন তো শোনে না। পাথর পড়ে থাকলেই শেওলা ধরবে। পা হড়কাবে। হঠাৎ কী একটা ঝলসে উঠল, মনে না ঘরে, বুঝতে পারলুম না। চিৎকার করে উঠলুম—কাবেরী! দুদ্দুড় পায়ের শব্দ।

'কী হয়েছে? কী দেখেছ?'

'শিগ্‌গির বাঁচাও, বাঁচাও। কেদারজেঠু আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন।'

আমার শরীরে বাঘের বল এসে গেছে। চওড়া বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটছি। এক এক লাফে তিন ধাপ নামছি। কাবেরী আমার সঙ্গে গতি রাখার চেষ্টা করছে।

অনেক রাত। পথ নির্জন। কেদারজেঠুর বাড়ির গেট বন্ধ। ভেতর থেকে তালা। দোতলার গেটের দিকে ঘরে আলো জ্বলছে। পর্দায় একটা ছায়া। রাস্তার ধারে একটা আধলা ইট পড়েছিল। তুলে নিয়ে জানলা লক্ষ্য করে গায়ের জোরে ছুড়লুম। ঝন্‌ঝন্‌ করে কয়েকখানা কাচ ভেঙে পড়ে গেল। ভেতর থেকে চিৎকার উঠল, 'কে, কে'। পল্টুদার গলা।

আমি চিৎকার করলুম, 'চোর চোর'। কাবেরীও গলা মেলাল।

ভেতরে একটা হুটোপাটি। সব আলো জ্বলে উঠেছে। কেদারজেঠুর ভেতরে সেই পুলিশ জেগে উঠল। সদরের দরজা খুলে গেল। কেদার জেঠুর হাতে লাঠি, পল্টুদার হাতে শাবল। কাবেরী বললে, 'সাবধান। অন্ধকারে চালিয়ে দিতে পারে।'

ভীষণ চড়া গলায় ধমকের সুরে বললুম, 'ছি ছি, জেঠু। এ আপনি কি করতে যাচ্ছিলেন, জানেন না, আত্মহত্যা করা পাপ, কাপুরুষতা।'

'কে? কে তুমি?'

আমরা দু'জনে আলোয় এসে দাঁড়ালুম। যেন ভূত দেখলেন, 'তোমরা?'

ঠেলে সরিয়ে সোজা দোতলায়। কেদারজেঠুর মস্ত শোবার ঘর। একপাশে বড় খাট। ইংরেজ আমলের গোল টেবিল। চারখানা উইম্বলডন চেয়ার। সোফা। দেয়ালে অয়েলপেন্টিং। এক আলমারি বই। কোণে একটা স্ট্যাচু। এক হাতে উঁচু করে ধরা বাতিদান। খাটের মাথার দিকের দেয়ালে, দেয়াল জোড়া ছবি—রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বনবাসে চলেছেন।

গোল টেবিলের ওপর রিভলভার। পাশে একটা লেখা—

'অনেকদিন এসেছি। অনেক দেখেছি। অনেককে বিদায় জানিয়েছি। আমি চললুম। কেউ দায়ী নয়।'

জেঠু আর পল্টু ঘরে। আমাদের পেছনে। লেখাটা কুঁচি কুঁচি করলুম।

পল্টুদা বললে, 'কি সর্বনাশ! একটা চোরকে সাধু করে শেষে নিজেই চোর হচ্ছিলেন। আমি ঘটি-বাটি চোর, আর আপনি হতে চাইছিলেন জীবন চোর!'

কাবেরী জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার কীসের দুঃখ! কে নেই? কী নেই?'

ঘড়ি শব্দ করে দুটো বাজাল। সেই হু হু বাতাসটা এল। রোজ যেটা আসে। সেই বেড়ালটা একবার ডেকেই থেমে গেল। এই সেই সময়! যে সময় কালপুরুষ নেমে আসে। ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিতে থাকে প্রদীপ। ঝুম্ করে ঘুঙুরের শব্দ। রাজনর্তকী।

'বসুন আপনি। অপরাধী, ভীরু, কাপুরুষ!'

'তুমি কী করে জানলে? অবাক কাণ্ড!'

'কী করে জানলুম, সে আমিও জানি না। তবে আমি সব জানতে পারি। আপনি আমাদের আদর্শ, আমাদের হিরো। দুর্বল হলে আমরা কোথা থেকে বল পাব?'

'আমার যে ক্যানসার।'

'আপনার ক্যানসার হয়নি।'

'বলছে যে।'

'বলুক। আপনার শরীরে ক্যালসিয়াম ঘাটতি হয়েছে। দুধ খান। নব্বই বছরের আগে আপনার কিছু হবে না।'

'কী করে বলছ?'

'আমি জানি না।'

'কী করে বিশ্বাস করব?'

'আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তেরো লক্ষ টাকা আছে। বালিশের তলায় সাত হাজার। আপনার ওই বিলিতি চাবসের সিন্দুকে একটা দামি হিরে আছে, কুচবিহারের মহারাজা আপনাকে দিয়েছিলেন। দশ বছর আগে উত্তরবঙ্গে তিস্তার ধারে ফরেস্ট বাংলোতে আপনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, সেই সময় বুনো হাতির দল ঢুকে পড়েছিল। চতুর্দিকে চিৎকার। আপনি বেরিয়ে এসে এই রিভলভার থেকে পর পর ফায়ার করে ম্যাগাজিন খালি করে দিয়েছিলেন। সে-রাতে আত্মহত্যা করা হল না। পরের দিন হঠাৎ আপনার পরিচয় এক সুন্দরী নেপালি মহিলার সঙ্গে। দুজনেই প্রেমে পড়লেন। বাঁচার ইচ্ছা প্রবল হল। সেই মহিলা আপনাকে বাঁচতে শেখালেন। আপনাদের একটি সন্তান আছে। বর্তমানে তিনি ইংল্যান্ডে। নামকরা ডাক্তার। তিনি আপনার পদবি ব্যবহার করেন না। তিনি আজও জানেন না তাঁর প্রকৃত পিতা কে।

এই রিভলভারটা অনেক হাত ঘুরে আপনার হাতে এসেছে। এটার প্রথম মালিক সেই কুখ্যাত চার্লস টেগার্ট। এটি আপনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন পশুপতিনাথ মন্দিরের পেছন থেকে। এটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আত্মহত্যার প্রবণতা। মন্দিরের পেছনে যে ফেলে গিয়েছিল, সে একজন খুনি। আজও ধরা পড়েনি। পড়বেও না, কারণ সে খুন হয়ে গেছে রক্সৌল বলে একটা জায়গায়। সকলের ধারণা সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। লোকটা ধর্মের ভেক ধারণ করে টাকা, বিষয় হাতাচ্ছিল। মেয়েদের ভোগ করছিল। দু-দশটা খুন তার কাছে কিছুই নয়। পূর্বপুরুষ মরিসাসে আখচাষে ক্রীতদাস হয়ে বসবাস শুরু করেছিল। এই লোকটা এসেছিল সেখান থেকে। বিশাল চেহারা। চেলারা রটিয়ে দিলে দ্বিতীয় ত্রৈলঙ্গস্বামী। গভীর রাতে শিব এসে কাঁধে হাত রেখে রোজ পাঁচ হাজার হাত হাঁটেন। একে বলে হণ্টন-জপ। ইষ্টের হাত কাঁধে। ত্রিশূলের ঠন্‌ঠন্ শব্দে বীজমন্ত্র। সেই কারণে বিশ্বে বাবার পরিচয়—ঠনঠনিয়ে বাবা। মাঝে মাঝে তাঁর মুখ দিয়ে এক ধরনের অ্যাসিড ঝরে পড়ে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বলেছেন—Oxalic Acid. Ox হল ষাঁড়। শিবের বাহন। শিবকে পিঠে নিয়ে ত্রিভুবন ঘুরছে। এই পরিশ্রমে তার মুখ দিয়ে লাল পড়ছে। এই লালাই হল Oxalic Acid. বাবার Bull এই ঠনঠনিয়া বাবা। এই অ্যাসিড সব ময়লা পরিষ্কার করে। ঝকঝকে। ভেতরে ভগবান এসে যে-বেদিতে বসবেন, সেই বেদিকে করতে হবে দুধ-সাদা। সমুদ্রের ফেনা। এক শিশির দাম পাঁচ হাজার টাকা।'

হঠাৎ কেদারজেঠু বিদ্যুৎগতিতে রিভলভারটা তুলে নিয়ে ভুরুর মাঝখানে চেপে ধরে ট্রিগার টিপলেন। কাবেরী আর পল্টু চিৎকার করে উঠেছে। আমি হাসছি। খট্ করে শব্দ হল, গুলি বেরল না। বারকয়েক খট্‌খট্। পোড় খাওয়া পুলিশ অফিসার অবাক। আমি বললুম, 'জেঠু! লক করে দিয়েছি। চিরকালের জন্যে। এত বলার পরেও আবার কেন?'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'তুমি যে আমার সব গোপন খবর জেনে গেছ। কীভাবে জানলে? আমার অবাক লাগছে। তোমাদের কাছে আমি যে সম্মান হারালুম। তোমরা আমাকে এতকাল যা ভেবে এসেছ আমি তো তা নই। এক বিবাহিত মহিলার সংসার আমি ভেঙেছি। তার নিরীহ স্বামীকে আমি জেলে ভরেছি। সবচেয়ে বড় কথা কী জানো, আমি আমার স্ত্রীকে সে-দিন

একটু চেষ্টা করলেই বাঁচাতে পারতুম। আমি চেয়েছিলুম সে মারা যাক। আমি পাপী, আমি খুনি! শ্রীকান্ত আমার বাঁচার অধিকার নেই।'

'আপনি কোনো পাপ করেননি। সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষের ধর্ম পালন করেছেন। আপনি আমাদের শ্রদ্ধা হারাননি। আপনি আমাদের প্রিয় কেদার জেঠু। আপনি ভারত সরকারের গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। অতীত ভুলে যান।'

বিমর্ষ কেদারজেঠু ঘরে কয়েকবার পায়চারি করলেন। খুব অসহায় মনে হল। সেই অলৌকিক ভৈরবী সেই অলৌকিক রাতে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, শ্মশানই আপন। পৃথিবীতে আপনজন খোঁজার চেষ্টা বৃথা সময় নষ্ট। স্রোতে ভেসে চলা কচুরিপানা—এই কাছে এল তো, এই দূরে ভেসে গেল।

'আপনার বাড়ির পেছন দিকে যে কুয়োটা আছে, সেই কুয়োয় এই রিভলভারটা ফেলে দিন। এখুনি আমাদের সামনে। আপনার জীবনে এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কাবেরী, বিছানায় বালিশের তলায় আর একটা ছোটো রিভলভার আছে নিয়ে এস।'

কাবেরী কিছুটা সন্দেহ নিয়েই এগোল। বালিশটা তুলতেই বেরিয়ে পড়ল ছোটো একটা যন্ত্র। যেন খেলনা। ভীষণ শৌখিন।

'এটা আপনি নেপাল থেকে পেয়েছিলেন। ইউরোপীয় এক চোরা-চালানকারী আপনাকে দিয়েছিল। একটা গুলি, একবারই ফায়ার করা যায়। ম্যাগাজিনে গুলি নেই। পল্টুদা কী বুঝছ?'

'খুব খারাপ।'

'তাহলে তোমার সারুকে এইবার নিয়ে এস।'

চমকে উঠেছে, 'কী করে জানলে?'

'ও প্রশ্ন আর কোরো না।'

জেঠু বললেন, 'কী ব্যাপার! সারু?'

'আপনাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছে। খালের ধারে গোস্বামী ভিলায় থাকে। ও আপনাকে চোখে চোখে রাখবে, সেবা করবে। লেখাপড়া জানে।'

জেঠু দুঃখের গলায় বললেন, 'আমাকে জানালি না কেন?'

পল্টু বললে, 'যদি আপনি রাগ করেন।'

তিন

এই প্রাচীন, নোনাধরা, নিষ্কর্মা মানুষদের পাড়াটা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। একটা একঘেয়ে ওয়াল ক্লকের পেন্ডুলামের মতো দুলছে আর দুলছে। নতুন কিছু নেই। আবার নতুন পাড়াতেও নতুন কিছু নেই। ঠ্যাঙা ঠ্যাঙা ফ্ল্যাট। এক একটার এক একটি পরিবার মানসিকভাবে সবাই অসুস্থ। প্রমাণ, তাদের চেহারা, মুখ-চোখ। মুখ আর চোখই বলে দেয় মানুষটা কেমন? কেউই বিশ্বস্ত নয়। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। এমন মশলা দিয়ে ইট গাঁথা, যে-মশলায় আঁট নেই। জীবনের পথে চলতে চলতে অনেকেই ভাবেন, জীবন থেকে জীবন পালিয়ে গেছে। মানুষের আকৃতি আছে প্রকৃতি নেই।

'কাবেরী! আমি এইবার যাই, তুমি আমাকে অনেক দিন সন্তানের মতো লালন-পালন করলে।'

'কোথায় যাবে?'

'রহস্যের সন্ধানে।'

'কী রহস্য?'

'আমাকে কেউ কিছু করে দিয়েছে। আমি একই সঙ্গে তিনকালে রয়েছি, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। আমার জীবনের বাউন্ডারিটা কেউ নষ্ট করে দিয়েছে। পাঁচিল ভেঙে দিয়েছে। খুব অস্বস্তি হচ্ছে। মানুষ বই পড়ে। আমি সকলের জীবন পড়ে ফেলছি। মানুষের সমাজে আমার আর থাকা চলে না।'

'দাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। বললে, তোমার মাথার বিশেষ একটা জায়গা যেভাবেই হোক খুলে গেছে, যে-জায়গাটা সাধারণ মানুষের বন্ধই থাকে। তুমি এক বিরল মানুষ। দাদা তোমাকে চোখে চোখে রাখতে বলেছে। বলেছে, তুমি একটা রেয়ার কেস। স্টাডি করার মতো। বলছিল, মেক্সিকোয় এক ধরনের মনসা গাছ হয়, সেই গাছ থেকে এক ধরনের মদ তৈরি হয়—'ফেকিলা', সেই মদ খেলে পৃথিবীটা অলৌকিক হয়ে যায়। আলোর রং পালটে যায়। রাস্তা আকাশের দিকে উঠে যায়। খাবার টেবিলের ওপর মটরগাড়ি এসে থামে। অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়, যে শব্দ পৃথিবীতে হয় না। তোমাকে তো আমি একা ছাড়তে পারব না। কোথায় যেতে চাইছ?'

'সেই জায়গাটায়, তারকেশ্বরের রেললাইনের ধারে। তারপর সেই চায়ের

দোকানে, যেখানে ভৈরবীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেই শ্মশানে, কুঠিয়ায়। শিব, বেলগাছ, ধ্বংসস্তূপ।'

'আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

'আমি কাশীতেও যাব। কেদারঘাটে।'

'আমিও যাব।'

'আর ফিরব না!'

'আমিও ফিরব না।'

'কেন?'

'তুমি সব জানো। জানো না?'

'হয়তো।'

'হয়ত নয়, তুমি জান। তুমি কেন আমাকে টানো? তোমার এই আকর্ষণ! আমি আমার দাদাকে ছাড়া সব পুরুষকে ঘৃণা করি। তাদের মন নোংরা, নজর নোংরা। দেহ আর স্বার্থ ছাড়া তারা কিছু জানে না। ভগবান যদি পুরুষ হন, তাহলে আমি তাঁকেও ঘৃণা করি। একমাত্র মহাদেবকে আমি বিশ্বাস করি। সাচ্চা পুরুষ। কোনো লুকোচুরি নেই। যেমন বড়লোক, সেই রকম গরিব। কখনো রাজপ্রাসাদে, কখনো শ্মশানে। নেশা করে নর্দমায় পড়ে থাকেন না। ত্রিশূল হাতে নৃত্য করেন। ষাঁড়ের পিঠে চেপে জগৎ ঘোরেন। আমি পার্বতী!'

'তোমার দিদিমার মা ছিলেন সাধিকা। সব ত্যাগ করে হরিদ্বারে চলে গিয়েছিলেন। হাতি, ঘোড়া, পেয়াদা, পালকি। ষোলোটা থামঅলা প্রাসাদের মতো বাড়ি। পড়ে থাকল। তিনি চলে গেলেন। সঙ্গে ছোট্ট একটা পুঁটলি।'

'তুমি কার কাছে শুনলে?'

'শুনিনি, কিন্তু জানি। এটাই তো আমার অসুখ। ডাক্তার-বদ্যি আমার কিছু করতে পারবে না। প্রথমে আমি কাশী যাব। আমার তো পিছুটান কিছু নেই। আমার বাড়ি তো চামচিকির বাসা। দুটো দামি জিনিস সেখানে। আমার মায়ের বিয়ের বেনারসিটা। ওই শাড়িতে আমার মায়ের শরীরের ছাপ আছে। কোথাও চন্দনের ছিটে, কোথাও একটু সিঁদুর। সারা শাড়িতে মায়ের গন্ধ। আঠারো বছর বয়সে মায়ের বিয়ে হয়। আমি তখন যোধপুরে।'

'তুমি যোধপুরে মানে? তোমার বাবা কি দু'বার বিয়ে করেছিলেন?'

'না, তখন আমি এক বৃদ্ধ রাজপুত। বলিষ্ঠ একহারা চেহারা। বিবাহ

করিনি। একটা ঘোড়া, আর একটা উট ছিল। একটা মেয়ে আমাকে ভালোবাসত। আমিও ভালোবাসতুম। বিয়ে করার সময় পাইনি। কাশীতে চলে এসেছিলুম। সংস্কৃত শিখব, সাধন-ভজন করব। একদিন নিরুদ্দেশ। পঁচাশি বছর বয়সে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। আঠারো বছর বয়সে মা আমাকে গর্ভে ধারণ করলেন। কেউ জানল না, কে এল, কোথা থেকে এল। তখন আমিও জানতুম না। হঠাৎ এক জোড়া রেললাইন আমার সময়ের লাইন খুলে দিল।

এদিকে-ওদিকে। তোমার এসব বিশ্বাস করার দরকার নেই। যদি বলি তুমিই সেই মেয়েটি, তুমি বিশ্বাস করবে? প্রমাণ কোথায়।'

'বিশ্বাসও প্রমাণ হতে পারে!'

'বিশ্বাস কি সকলের থাকে?'

'ভক্তি থেকে বিশ্বাস আসে। আমি তোমার ভক্ত।'

'তুমি এই ভক্তি সঙ্গে করে এনেছ, সঙ্গে করে এনেছ পুরুষ জাতির প্রতি ঘৃণা। কারণ এক রাজপুত সর্দারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল। খুব কষ্ট পেয়েছিলে। সেই সময় মরুভূমির দিক থেকে এক অদ্ভুত মানুষ এসে তোমাকে একটি মদনমোহনের মূর্তি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর ঝোলায় ছিল একটি বাঁশি, একটি গীতা, আর এক জোড়া পাখির ঠোঁট। হলদে রং। প্রথম প্রথম তাঁর খবর রাখা হলেও শেষকালে কী হল কেউ জানে না। আজও হিমালয়ের একটি গুহায় তাঁর আসন, কমণ্ডলু আর একটি লাঠি পড়ে আছে। ওপর থেকে বিরাট একটা পাথর পড়ে গুহার মুখটা বন্ধ হয়ে আছে। সেই পাথরের ওপর আরও অনেক পাথর জমা হয়েছে। কোনোদিন যদি প্রাকৃতিকভাবে পাথরটা গড়িয়ে নীচে নেমে যায় তাহলে গুহার মুখটা খুলে যেতে পারে। সাধিকা ওই পাথরের তলায় চাপা পড়ে আছেন। তিনি ফসিল হয়ে গেছেন। পাথরের গায়ে তাঁর চোখ দুটো লেগে আছে। লেগে থাকবে। অনেক অনেক বছর পরে ওই পাথর একদিন নেমে আসবে। এক তিব্বতি সাধু দেখতে পাবেন। প্রথমে ভয় পাবেন। পাথরের গায়ে মানুষের চোখ। তিনি পুজো করতে থাকবেন। সেখানে একটি গুম্ফা তৈরি হবে। দেবীর নাম হবে 'কমলাক্ষী'। কেউ জানবে না ব্যাপারটা কী? ওদিকে চিনের দিক থেকে একটা রাস্তা আসবে। বাণিজ্য পথ। আমি সব দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। প্রচুর প্রজাপতি সারা দিন উড়ে বেড়াবে ওই গুম্ফার পেছন দিকে, দুধের মতো

সাদা। শীতকালে সব বরফে ঢেকে যাবে।'

ওপরের আসনে আমি, নীচের আসনে কাবেরী। আমাদের সঙ্গে বিশেষ কিছুই নেই। মা আমাকে নগদ কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। বড়ো একটা সিল্কের রুমালে জড়ানো। একটা দামি পাথর বসানো আংটি। 'বউকে দিস! চেষ্টা করতে হবে না। সে আসবে। মানুষ যেমন বেড়াতে বেড়াতে এসে দরজায় কড়া নাড়ে।' সেই পুলিন্দাটা কাবেরীর কাছে গচ্ছিত করে দিয়েছি। কী আছে কত আছে আমি জানি না। ওইটা দেবার সময় আমার এইরকম মনে হয়েছে, যেন আমি আমার জীবনটা দিয়ে দিলুম। আমার মাথা থেকে মাথাটা যে কখন বেরিয়ে যাবে, আর কোনো মাথা এসে ঢুকবে তা তো জানি না। কাবেরীর দাদা মস্ত বড়ো ডাক্তার। মানুষের মাথার সব কিছু জানেন, মানে গবেষকরা আজ পর্যন্ত যতটা জেনেছেন। তিনি সব পরীক্ষা-টরিক্ষা করে বলেছেন, আমাকে নয়, কাবেরীকে, এই অসুখটার নাম হ্যালুসিনেশান। কাবেরী তর্ক করেছিল, সব মিলে যাচ্ছে কী করে?

সবটাই যে মিলছে, 'তা বলছিস কী করে? বেশির ভাগই তো গল্প।'

কাবেরী আর তর্ক করেনি। এসব নিয়ে তর্ক চলে না। আমার নিজের কোনো দাবি নেই। কাবেরীর দিদিমা যে মদনমোহন পেয়েছিলেন, এ তো গল্প নয়। সেই মূর্তি সাঁইথিয়ার এক মন্দিরে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি দিনের দিন সেই ঠাকুর বৃন্দাবনে গোস্বামী প্রভুর কাছে গিয়ে হাজির। এদিকে সিংহাসন খালি। সবাই ধরে নিলে মূর্তি চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে। থানায় ডায়েরিও করেনি। মস্ত সাধক গোস্বামী প্রভু। মদনমোহন তাঁকে বলেছিলেন, ওরা সব ম্লেচ্ছ, চরিত্রহীন। পূজারির রক্ষিতা আছে। বউটাকে খেতে দেয় না। একগণ্ডা বাচ্চা। রক্ষিতার গর্ভ হয়েছিল। ভ্রূণ হত্যা করেছে। আমি তাকে সাজা দেব। সেই পুরোহিত আপ লাইনের ট্রেনে কাটা পড়লেন। তাঁর বউ বিধবা হতে অস্বীকার করলেন। গ্রামে প্রথম বিদ্রোহী নারী। পুরুষরা যা খুশি করবে, আর মেয়েরা তার মাশুল দেবে! ভদ্রমহিলা কাঁচরাপাড়ায় এলেন। মদনমোহন স্বপ্ন দিলেন, তোর স্বামীকে আমি নিয়েছি, তোর ছেলেটাকে আমি মানুষ করে দেব। সেই ছেলে গ্লাসগো থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এল। এ তো মিথ্যে নয়। সাঁইথিয়ার 'মাধব কুঞ্জ' এক বিখ্যাত জায়গা। সেই ছেলে বৃন্দাবন থেকে

মদনমোহন নিয়ে এলেন। তিনিই হলেন পুজারি। বড়ো চাকরি। দুটো দায়িত্বই তিনি পালন করতেন। বড়ো একটা কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করে বহু ছেলেকে জীবনে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভাইবোনদের উচ্চশিক্ষিত করেছিলেন। ছোটো ভাই খ্রিস্টান হয়ে ইথিওপিয়ায় বিশপ হয়েছিলেন। সবাই বলত লম্পট বাপটা না মরলে এসব কিছুই হত না। একটা কথা বলত না কেন? বাপের রক্তে এইসব বীজ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, কলির মায়া কামকাঞ্চন। ভদ্রলোক সেই মায়ায় ফাঁদে ফেঁসে গিয়েছিলেন। পরে তাঁর স্ত্রী কঠোর বৈধব্য ধারণ করলেন, যখন তিনি জানতে পারলেন সেই স্ত্রীলোকটি রক্ষিতা ছিলেন না, ছিলেন তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী এবং স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা হয়েছেন। পুরোহিতের চরিত্র সম্পর্কে যেসব কথা প্রচারিত হয়েছিল তা আর এক মহিলার রটনা। তিনি ছিলেন মন্দিরের দাসী। পুরোহিতকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন যথেষ্ট ; কিন্তু ভালোবেসে ফেলেছিলেন। এক ঝড়ের রাতে মন্দিরের গর্ভগৃহে দুজনে আটকে পড়েছিলেন। অপ্রশস্ত জায়গা। সিংহাসন, ঘট, গঙ্গাজলের জালা, ঠাকুরকে শয়ন দেবার খাট, এটা-ওটা অনেক জিনিস। বাধ্য হয়েই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে হয়েছিল। ছাঁট আসছিল বলে দরজা বন্ধ। প্রবল বাতাসে প্রদীপ নিবে গেছে। মন্দিরের পেছনে অনেকটা জংলা জায়গা। ঘন ঘন বিদ্যুৎ। কড়কড়ে বাজ। দাসীর দেহটিতে দুর্দান্ত যৌবন। অনেক বড়ো মাপের মানুষ লেহন করেছে। মেয়েটির স্বামী এইসব দেখে শুনে বুঝে গিয়েছিলেন, সিঁথির সিঁদুরের জন্যে এই ভয়ঙ্কর খাদ্যটির পাশে পুতুল স্বামী হয়ে বসে থাকার মানে হয় না। এর সঙ্গে সংসার হবে না। বড়োলোক লম্পটরা সন্ধান পেয়ে গেছে। ছেলেটি ছিলেন কাঠের কাজের এক নম্বর মিস্ত্রি। সাঁইথিয়ার রাজবাড়ির সমস্ত কাঠের কাজ করেছিলেন। ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল। বাটালি, র‍্যাঁদা, এই মানুষটির হাতে যেন বেহালা। মেয়েটাকে খুন করে ফাঁসিতে ঝোলার চেয়ে মানুষটি চলে গেলেন হায়দারাবাদে নিজামের রাজত্বে। সেখানে থাকতেন তাঁরই এক দোস্ত। নিজাম এই কারিগরটিকে লুফে নিলেন।

ঝড়ে মন্দিরের পেছন দিকে বহুদিনের প্রাচীন একটি কদমগাছে কানফাটানো শব্দে বাজ পড়ল। মন্দিরের ভেতরটা নীল আলোয় ঝলসে উঠল। মেয়েটি ভয়ে পুরোহিত মশাইয়ের ঘাড়ে। যতই হোক মানুষ তো। বেদ-বেদান্ত,

উপনিষদ, ভাগবত যতই পড়ুন, যুবতী যদি জড়িয়ে ধরে। বাইরে ঝড়, ভেতরেও ঝড়। ঝটাপটি অন্ধকার ঘর। শন্‌শন্‌ বাতাস। কড়কড় বাজ। দেবতা সিংহাসনে বসে জীবজগতের কাণ্ড দেখছেন। ঘট উলটে গেল। কোশাকুশি ছিটকে গেল। প্রদীপ সমেত পিলসুজ ঠিকরে গেল। ঝড় থামল। চাঁদ উঠল। পরের দিন দেখা গেল সিংহাসনে মদনমোহন নেই। রতিক্রিয়ায় মন্দির অপবিত্র হয়েছে।

ট্রেন এইবার ছাড়বে। স্টেশানে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা। একটি মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উলটো দিকের আসনে বসল। ট্রেন ছেড়ে দিল গল্‌গল্‌ করে। যেন একটা তরল পদার্থ। স্রোতের মতো। মেয়েটি নিশ্চিন্তে বসে, কাবেরীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'কাবেরী না?'

'তুই সুমিতা! উঃ, কতদিন পরে! একবার মনেও পড়ে না?'

সুমিতার চোখে জল। মুখটা একদিকে ঘুরিয়ে চোখ মুছল।

কাবেরী উঠে গিয়ে পাশে বসে, এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললে, 'কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন?' সুভাষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। সুভাষকে কাবেরী চেনে। বিয়ের সাতদিন পরে দুজনে পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিল। পুরী স্টেশানে নামামাত্রই একজন পাগল টাইপের লোক হঠাৎ এসে বললে, প্রভু জগন্নাথদেব বলে পাঠালেন, তোমরা ফিরে যাও, বিপদ আছে।

দুজনে হাসছে। নিমেষে লোকটা যেন উবে গেল। সেইদিন বেলা বারোটার সময় সুভাষ পুরীর সমুদ্রে তলিয়ে গেল। অথচ সে খুব ভালো সাঁতার জানত। সুমদ্রের ধারে ভিড়। নুলিয়ারা চেষ্টা করছে যদি উদ্ধার করা যায়। সুমিতার কানে এল, কে যেন বলছে, বারণ করলুম, শুনল না। সাতদিনের বিয়ে। এক ফুঁয়ে অন্ধকার!

সুমিতা বললে, 'এসব কথা ছাড়। বিয়ে করলি নাকি!'

আমার দিকে তাকাল।

কাবেরী বললে, 'না।'

'ও কে?'

'জানি না কে। তবে এইটুকু জানি, ওকে ছাড়া আমার জীবন অচল।'

কাবেরীকে বললুম, 'তোমার বন্ধুর মধ্যে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি— বলব?'

'হ্যাঁ বলো।'

'সুমিতাকে আবার বিয়ে করতে হবে। বয়েসে অনেক বড়ো। বাবার বয়সিও বলা যেতে পারে। সাদা রঙের সুন্দর বাড়ি। চারপাশে বাগান। গেটের দু'পাশে বড়ো বড়ো দুটো চাঁপাগাছ। গ্যারেজে কালো রঙের মোটর গাড়ি। একটা গ্লোডেন রিট্রিভার কুকুর। ভদ্রলোক একজন নামকরা অ্যাটর্নি। প্রচুর পয়সা।'

সুমিতা টান টান, বললে, 'পম্পার বাবা। পম্পা আমেরিকায়। একেবারে নিঃসঙ্গ মানুষ। সব আছে, কেউ নেই। বাড়ির সামনের দোকান থেকে খাবার আনিয়ে খান। একেবারে নির্বিবাদী মানুষ। রাগতে জানেন না। চেহারা দেখলে বোঝার উপায় নেই বয়েস কত। বিয়ে-টিয়ে জানি না। একবার বিয়ে করে খুব শিক্ষা হয়েছে। অপয়া, রাক্ষসগণ, এইসব বলে শ্বশুরবাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছে। আমি এই চমৎকার মানুষটির সেবা করতে চাই।'

'সামনের ফাল্গুনে বিয়ে। প্রচুর সম্পত্তির মালিক হবে।'

'আপনি জ্যোতিষী কি না জানি, তবে ভদ্রলোক প্রোপেজ করেছেন, আমিও কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছি। ভয় পাচ্ছি এই ভেবে, যদি মারা যান।'

'সে ভয় নেই। ভদ্রলোক অনেক দিন বাঁচবেন। প্রায় নব্বই।'

আর একগাদা কথা বলার ইচ্ছে হল না। শুধু এইরকম মনে হল, শনির কোলে শনি, ভালোই থাকবে। মেয়েটির চেহারা কথা বলার ধরন-ধারণে শনির প্রবল প্রভাব। আর যে ভদ্রলোকের কথা বলছে তার চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছি। পাকা চুল। লম্বা। মেদহীন শরীর। ধার্মিক! মা কালীর ভক্ত; কিন্তু কামুক। জীবনকে মনে করেন জুয়া। শেষ জীবনে প্রচুর পয়সা আসবে। মেয়েটি নিজেকে কষ্ট দিতে ভালোবাসবে। বন্ধ্যা।

কি সব খাওয়া হল। এদিক-সেদিক। বাঙ্কে উঠে পড়লুম। ট্রেন দুলছে। ঘুম আসছে। সমবেত উল্লাসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, 'হর হর গঙ্গে। বাবা বিশ্বনাথজি কি জয়।' জানলার ধারে বসে এক বৃদ্ধা। দু'চোখে জল। লম্বা নাক। ধারাল মুখ। মালব্য ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে গমগম শব্দে। পবিত্র আকাশ। পবিত্র বাতাস।

আধখানা চাঁদের মতো একটি ভূখণ্ড। সব তীর্থের সেরা তীর্থ বারাণসী। উত্তরবাহিনী গঙ্গা। দুটি ছোটো নদী, বরুণা আর অসি এক জায়গায় এসে

মিলেছে, নাম তাই বারাণসী। মস্ত প্ল্যাটফর্ম। মহা ব্যস্ততা। ট্রেনের গায়ে লোহা লোহা গন্ধ। কতরকমের সাধু। সেই বৃদ্ধা একা দাঁড়িয়ে। কারও অপেক্ষায়। কেউ নিতে আসবে। আসেনি। অনেকের জন্যে অনেকে এসেছেন। একজনের জন্যে এখনো কেউ আসেনি। সুমিতা বললে, 'তোরা কোথায় উঠছিস?'

কাবেরী বললে, 'কিছুই জানি না। সব ও জানে।'

'আমিও কিছু জানি না। কোথাও একটা কিছু জোগাড় করে নেব।'

'আমার সঙ্গে চলুন। একেবারে একা। আমার তো কেউ নেই। সুমিতা বলে ডাকার কেউ নেই। সে না থাক। সবাইয়ের সব কিছু থাকে না। কাটি পতঙ্গ। হাওয়ায় ভেসে ভেসে চলেছি।'

কাবেরী বললে, 'চল যাই। বেশ সংসার, সংসার খেলা হবে ক'দিন।'

স্টেশনের বাইরে যাবার সময় দেখলুম, সেই সুন্দর বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কোথায় যাবেন মা!'

বৃদ্ধা অবাক হয়ে তাকালেন। বললেন, 'ওরা বলেছিল হিরু আমাকে নিতে আসবে।'

'ওরা মানে?'

'আমার ছেলে আর ছেলের বউ। ওরা তো আর আমাকে রাখবে না।'

'হিরু কে?'

'ওদের কোনো চেনা লোক। এখানে ব্যবসা করে। কলকাতায় গেলে ভবানীপুরে আমাদের বাড়িতে ওঠে। মোটা মতো। খুব পান খায়।'

'যদি না আসে?'

'আমি জানি, আসবে না। ওরা আমাকে দিয়ে ভবানীপুরের বাড়িটা লিখিয়ে নিয়েছে। লিখে দিতে চাইনি। আমার গায়ে ফুটন্ত গরম জল ঢেলে দিয়েছিল।'

সুমিতা বললে, 'আমাদের সঙ্গে চলুন। এই অপমান সহ্য করবেন না। আমার কেউ নেই; আজ থেকে আপনি আমার মা।'

বৃদ্ধা কেঁদে ফেললেন।

দশাশ্বমেধ রোড ধরে আমরা চলেছি। গোধুলিয়ার কাছে এসে গাড়ি বাঁদিকে ঘুরল। ডান দিকে একের পর এক মুসলমানদের দোকান। বাঁ দিকে বাঙালিটোলা। তারপরেই কেদারের মোড়। বাঁ দিকে কেদারের গলি।

আমি কখনো আসিনি; কিন্তু যতই এগোচ্ছি মনে হচ্ছে, আমার ভীষণ চেনা। এইবার আমার নিজের ওপরই নিজের ভীষণ রাগ হচ্ছে। ন্যাকা নাকি? ঘ্যান ঘ্যান, ঘিন ঘিন। কী সব অবাস্তব কথাবার্তা। এর এই হবে, ওর ওই হবে। আমি সাধকও নই, ভগবানও নই। ডাহা একটা নিষ্কর্মা মানুষ। লেখক হব। কী লিখবে তুমি? কে ছাপবে!

বৃদ্ধা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ওই যে হিরু, ওই যে হিরু! দোকানে বসে আছে। গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও।'

দোকানের সামনে থামল। বৃদ্ধা ডাকলেন। কাপড়ের দোকান। রঙের স্বপ্নপুরী। হিরুবাবু গাড়ির কাছে এসে অবাক, 'এ কি মা, আপনি?'

'তুমি তো বাবা স্টেশানে গেলে না।?'

'আমি তো মা কিছুই জানি না।'

'ওরা তোমাকে জানায়নি?'

'কিচ্ছু না। আপনি আসবেন, আর আমি যাব না! আপনি তো আমার মা! আপনার আশীর্বাদে করে খাচ্ছি। এ দোকান তো আপনার! আপনি আমাকে টাকা দিয়েছিলেন।'

'ওরা আমার গায়ে গরম জল ঢেলে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখনো ঘা শুকোয়নি।'

হিরুবাবু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুক্ষণ, তারপর ভীষণ তৎপর হয়ে বললেন, 'নামুন, নামুন। আমি আপনাকে মাথায় করে রাখব।'

'বাবা, তোমার বউ? বউদের ভীষণ ভয় পাই।'

'ভয় নেই। সে খুব ভালো। আমার লক্ষ্মী। কুড়িয়ে এনে বিয়ে করেছিলুম। এরা কারা?'

'স্টেশানে নেমে তোমাকে দেখতে না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এবার বুড়িটা যাবে কোথায়—তখনই এরা এসে আমার হাত ধরল।'

বৃদ্ধা কাঁধে ঝোলা আর হাতে ব্যাগ নিয়ে নেমে গেলেন। আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করল। কোথায় যাচ্ছি জানি না। অনেকটা যাওয়ার পর কেদার ঘাটের কিছুটা দূরে ডানদিকে ছায়া ছায়া একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমেই অবাক হয়ে গেলাম—একি! এই তো সেই বাড়ি। ওই তো কেদার ঘাট। সেই যে দৃশ্যটা দেখেছিলাম—এক বৃদ্ধের মাথায় ছাতা ধরে ধাপে

ধাপে উঠছি, প্রবেশ করছি একটা বাড়িতে—যে বাড়িটা একটা দুর্গের মতো। বিশাল একটা কম্পাউন্ড। এধারে-ওধারে সরকারি দপ্তরখানা। ভেতরদিকে বেদ বিদ্যালয়। সেটা পেরিয়ে ডানদিকে গেলে একটা চাতাল। খাড়া একটা সিঁড়ি কোথায় কতদূরে উঠে গেছে। বাইরে ঘোড়ায় পায়ের শব্দ। একজন সাহেব হন্‌হন্ করে চলেছে—সেদিন যা দেখেছিলাম আজকে একটু অন্যরকম। দপ্তরগুলো রয়েছে কিন্তু সাহেবরা নেই, বাড়িটা অনেকটা প্রাচীন হয়েছে। পাথরের বাড়ি তাই ভেঙে পড়েনি তবে শেওলা জমেছে। সামনের ফাঁকা জায়গাটায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের একটা স্ট্যাচু। গলায় মালা দুলছে। ডানদিকের কোঠায় একটা হস্টেল হয়েছে। ছাত্রদের থাকার জন্য।

আমরা আরও ভেতরে ঢুকে গেলাম। অনেকটা। সেখানে আলাদা একটা বাড়ি। সেই বাড়ির রকে উঠে আমরা ডান দিকে চলেছি। খুব খানিকটা যাওয়ার পর সামনে তালাবন্ধ প্রাচীন একটা দরজা। সুমিতা অনেক চেষ্টা করে তালাটা খুলল। একটা প্রাচীন গন্ধ বেরিয়ে এসে আমাদের ধাক্কা মেরে চলে গেল। দরজার কব্জায় ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। শীতল প্রায় অন্ধকার একটি ঘর। ভেতরে আরও কয়েকটা ঘর আছে। পাথরের মেঝে। প্রথম ঘরটায় কিছুই নেই। দ্বিতীয় ঘরে ঢুকেই আবার একটা চমক। পাথরের বেদিতে এক মহাপুরুষের স্ট্যাচু। সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি। বিদ্যুতের কানেকশান কেটে দিয়েছে, মোমবাতি জ্বালানো হল। সেই আলোয় মূর্তিটা দেখে আমি ধুলোর ওপর থেবড়ে বসে পড়লাম। এই তো সেই মহাপুরুষ যার মাথায় আমি ছাতা ধরেছিলাম। সে কবে কোন্ সালে? তা আমি বলতে পারব না।

সুমিতা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি একে চেনেন?' আমি হ্যাঁ, না কিছুই বলতে পারলাম না। তার কারণ আমি ক্যালেন্ডারের বাইরের লোক। আমি পৃথিবীতে আছি বটে কিন্তু পৃথিবীর সময়ে বাঁধা পড়িনি।

সুমিতা বললে, 'ইনি আমার বাবার ঠাকুর্দা। বহুবছর আগে এই কাশীতে তিনি সাধন-ভজন করে মস্ত বড় এক মহাপুরুষ হয়েছিলেন। কাশীর রাজা তাঁকে এই বাড়িটি দিয়েছিলেন। আশ্রম আর চতুষ্পাঠী করার জন্য। সত্য-মিথ্যা জানি না, তিনি দেড়শো বছর বেঁচেছিলেন। মস্ত বড় তান্ত্রিক ছিলেন। সারারাত মণিকর্ণিকার শ্মশানে সাধন-ভজন করতেন। তাঁর অনেক শিষ্য-শিষ্যা ছিল, তারা পরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। শুধু ভাবছি, আমি কি তাহলে পূর্বজন্মে এই সাধকের শিষ্য ছিলুম! কে বলতে পারে! দিনটা ঘরদোর পরিষ্কার করতেই কেটে গেল। এখানে থাকতে হলে সবই জোগাড় করে আনতে হবে, ঘটি-বাটি হাঁড়ি-কুড়ি। সেসবের কী দরকার, বাইরে কোথাও খেয়ে নিলেই তো হয়। দেখা যাক এরা কী সিদ্ধান্ত নেয়। কিছুক্ষণ পরে আমরা আবার পথে নেমে এলাম। গঙ্গায় স্নান করতে হবে। বেরিয়ে আসার সময় ঘরের কোণে একটা জিনিস দেখে চমকে গেলাম। এই তো সেই সাদা ছাতাটা। হাত দিয়ে ধরে তুললে সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে যেতে পারে। পরে দেখা যাবে।

লোকে লোকারণ্য। কাশীতে সবসময় পূজার আবহাওয়া। যাঁরাই বাইরে থেকে এখানে আসেন তাঁদের চিন্তায় অন্য কিছু আর থাকে না। সবাই চলেছেন বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু, ফকির, সহায়-সম্বলহীন মানুষের দল। এই সেই কেদার ঘাট। ঘাটটি খুব সুন্দর। ধাপে ধাপে কত ধাপ নেমে গেছে জলের দিকে। চতুর্দিকে আলো আর আলো। মানুষের কলরব, হু হু করে গঙ্গা বহে চলেছেন। ওপারটা কত রহস্যময়। পানসি চেপে অনেকেই চলেছেন বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে। সারা বছরই এখানে উৎসব।

সে সময়টাকে খুঁজছিলাম, সেই সময়টা একেবারে আচমকা পেয়ে গেলাম। পাথর হয়ে বসে আছেন সময়ের বেদিতে। কাশীতে তখন মহা, মহা সাধকদের লীলা চলেছে। ত্রৈলঙ্গস্বামী, দয়ানন্দ সরস্বতী, ভাস্করানন্দ স্বামী। গঙ্গার ধারের ওই বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মথুরবাবুর সঙ্গে। কাশীর পুরোটাই অতীত। অতীতই এখানে বর্তমানের সাজ পরে ঘুরছে। দোকানে দোকানে অতীতেরই কেনা-বেচা।

ক্রমশই আলো কমে আসছে। সন্ধ্যা নামছে গঙ্গার জলে। একটু পরেই বিশ্বনাথের মন্দিরে আরতি শুরু হবে। কাশীতে ধর্ম ছাড়া আর কিছু নেই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তীর্থযাত্রীরা আসছেন। সকলেই কিছু একটা খুঁজছেন।

কাবেরী জিজ্ঞেস করলে, কাকে খুঁজছ, আমাকে বলবে?'

'সেই ভৈরবীকে। মহাপুরুষের সন্ধান পেয়েছি মূর্তিতে। সুমিতা ইতিহাস বলবে। যে-ছাতাটা মাথায় ধরেছিলুম, সেটা যে মিথ্যে নয়, তুমিও দেখলে। কী করে এসব হয়, আমি এখনো বুঝতে পারছি না। বাস্তব অবাস্তব। বর্তমানে অতীত ঢুকে পড়ছে!'

কাবেরী বললে, 'এস আমরা কোথাও বসি।'

কেদার ঘাটের সিঁড়িগুলো খুব সুন্দর। এ ঘাটে চব্বিশ ঘণ্টা স্নান হয় না যা হয় দশাশ্বমেধে। আমরা দুজনে একপাশে বসলুম। কাবেরী তার ডান হাতটা আমার ডান হাতে রেখে বললে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসার কিছু বোঝ?'

'কবিতার মতো। একা একা ভাবটা কেটে যায়। একটা আশ্রয়। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখার মতো। জ্বরের কপালে ঠান্ডা একটা হাত। জগৎ নদীর মতো বহে চলে যায়, দুজনে দাঁড়িয়ে থাকে গাছের মতো। সুখ-দুঃখের বাসা তৈরি করে পাখি। ডিমে তা দেয়। বাচ্চাদের উড়িয়ে দেয় আকাশে। ভোরে গান গায়। রাত হলে একজন আর একজনের বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে।'

'বাঃ, সুন্দর কবিতা। তুমি আমাকে ভালোবাস?'

'অনেকদিন থেকে। তোমার পথের দিকে তাকিয়ে দিন কেটেছে। স্বপ্ন দেখেছি কত। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরেছ। সবে বুঝি বিয়ে হয়েছে কপালে সিঁদুরের টিপ। একটু ঘষে গেছে। একটা চুল কপালে ঝুলে আছে। শিবমন্দিরে ঘণ্টার দড়ি ধরে টানছ, একটা হাত ওপর দিকে তুলে। আর কী আশ্চর্য! আমার মা পাশে দাঁড়িয়ে হাসছেন। এত হাসছেন, সব ঝাঁক ঝাঁক নানা রঙের প্রজাপতি হয়ে চারপাশে উড়ছে। আর আমি একটা ভিখারি, হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছি।'

'তার মানে তুমি শিব। অন্নপূর্ণার সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছ। আমাকে যে ভালোবাস, তা জানাওনি কেন?'

'ভয়ে।'

'কার ভয়?'

'তোমার ভয়। ভাঙা কোঠার চামচিকি, আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়াবে কোন সাহসে?'

'আমার পা-ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারবে?'

'এখুনি।'

'তার মানে তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবাস। শোন, আমরা আর ফিরব না ঘুপচি সংসারে।'

'আমারও সেই এক ইচ্ছে। দেশে দেশে ভেসে বেড়াব। শুধু বুঝতে পারছি না আমার কী হয়েছে?'

'দাদা সেদিন একটা কেস হিস্ট্রি বলছিল। ১৯৮৭ সালের জুন মাসে রাশিয়ায় একটা ঘটনা ঘটেছিল। ভদ্রমহিলার নাম, জুলিয়া ভোরোবেভা। বয়েস ৩৭। ৩৮০ ভোল্ট ইলেকট্রিক কারেন্টে শক লেগেছিল। ডাক্তার দেখে বললেন, মারা গেছে। মৃতদেহ মর্গে চলে গেল। দু'দিন পরে দেখা গেল ভদ্রমহিলা বেঁচে উঠেছেন। কিন্তু ছটা মাস ঘুমোতে পারলেন না। তার পরে হঠাৎ একদিন ঘুমিয়ে পড়লেন। অনেকদিন পরে ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখলেন অলৌকিক একটা শক্তি এসেছে। জানলেন কী ভাবে! সকালে বাজার করতে গেছেন দেখছেন-বাস স্টপে একজন মহিলা অপেক্ষা করছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন। এ কী দেখছি? ভদ্রমহিলার শরীরের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, যেন টি ভি দেখছেন। খবরটা ছড়িয়ে গেল। বিখ্যাত সংবাদপত্র ইজভেসতিয়া। রিপোর্টার এলেন সাক্ষাৎকার নিতে। সাংবাদিক লাঞ্চে যা যা খেয়েছেন ভদ্রমহিলা তাঁর পেটে সবই দেখতে পাচ্ছেন। একে একে সব বলে দিলেন। ডাক্তার দেখাতে গেছেন। ডাক্তারবাবু সামনে আসামাত্রই বললেন, আপনার একটা কান আর একটা কানের চেয়ে দুর্বল, চোখও তাই। দু'কানে সমান শুনতে পান না, দু'চোখে সমান দেখতে পান না। ওই রাশিয়ান ভদ্রমহিলা সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রে দেখতে পেতেন। তাঁর চোখ দুটো হয়ে গিয়েছিল— এক্সরে যন্ত্র। পিচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে তার তলায় কী আছে দেখতে পেতেন। মানুষের মাথায় ভগবান অনেক কিছু ভরে দিয়েছেন। সেই সব হঠাৎ যদি কাজ শুরু করে দেয় তাহলেই তোমার মতো অবস্থা হয়। তুমি অনেকক্ষণ রেললাইনের ধারে দাঁড়িয়েছিলে, মাথার ওপর হাইটেনশান লাইন। ভেতরে একটা শক্তি ঢুকে গেছে। তোমাকে নিয়ে দাদার সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে। ছেলেটার কী হল! দাদা ইংল্যান্ডের একটা ঘটনা বলছিল, এক ভদ্রমহিলা দোতলার বাথরুমে বাথটাবে স্নান করার সময় স্ট্রোক হল। জলে তলিয়ে যেতে যেতে ইচ্ছে হল—বাঁচব। সেই ইচ্ছেটাই দেহ থেকে বেরিয়ে এল সূক্ষ্ম শরীর হয়ে। নীচের তলায় নেমে এসে স্বামী খবরের কাগজ পড়ছিলেন, তাঁর

কাঁধে টোকা মারলেন পেছন দিক থেকে। তিনি কিছু দেখতে পেলেন না; কিন্তু তাঁর মনে হল, বাথরুমে কোনো বিপদ। ভদ্রমহিলাকে উদ্ধার করলেন, তিনি বেঁচে গেলেন। দাদা এইসব খুব স্টাডি করে। তোমার ছ'নম্বর ঘরটা খুলে গেছে।'

'আচ্ছা, আমরা যদি আলাদা কোথাও থাকি কেমন হয়?'

'আমিও তাই ভাবছি। সুমিতা কাল বলছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই ওর ওই ভদ্রলোক আসবে।'

'আমরা কোথায় থাকব?'

'ধর্মশালায়'।

'স্বামী-স্ত্রী না হলে থাকতে দেবে না।'

'আমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে দাও।'

'সে তো মিথ্যাচার।'

'তা হলে আজ রাতেই আমাকে বিয়ে করো। চলো, কোনো মন্দিরে যাই। আমার ভীষণ বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে।'

'দাদাকে না জানিয়ে?'

'কোনো একদিন গিয়ে প্রণাম করে আসব।'

পাগলের মতো খানিক কথা হল দুজনে। কলকাতায় থাকলে এতটা ঘনিষ্ঠতা হত না। এ আজকের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের।

'চলো, দশাশ্বমেধে যাই।'

'হেঁটে যাব।'

দূর, তা হলেও হাঁটতে ভালোই লাগছে। আলো-অন্ধকার, স্পষ্ট মানুষ, ছায়া-ছায়া মানুষ। গোধুলিয়ার কাছে একটা রিকশা এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেল।

'কেদারজেঠু।'

দুজনেই চিৎকার করছি—'জেঠু, জেঠু।'

রিকশা যাবে কোথায় ভিড় ঠেলে! পা চালিয়ে গিয়ে ধরে ফেললুম।

কেদারজেঠু চমকে উঠেছেন, 'তোমরা?'

'আপনি?'

'মন টিকল না। পালিয়ে এলুম। পাপ ধুয়ে পরিষ্কার করব। একটা নতুন জীবন শুরু করব।'

'কোথায় উঠবেন?'

'ওই তো রায়বাবুর লজে। তোমরা কোথায় উঠেছ?'

'কেদার ঘাটে। চলুন আপনার জায়গাটা দেখে আসি।'

দোতলায় সুন্দর ঘর। পেছন দিকে গলি। সামনে বড় রাস্তা। কেদার- জেঠু জানলা খুলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমরা বললুম, 'বিশ্রাম করুন, কাল আসব।' মন্দির ঘুরে আমাদের জায়গায় এসে দেখি দরজায় সেই মরচে ধরা তালাটা ঝুলছে। আর একটা কাগজ গোঁজা রয়েছে। সুমিতার চিঠি—'এইমাত্র কলকাতা থেকে খবর এল পথদুর্ঘটনায় আহত হয়ে বিমলবাবু হাসপাতালে প্রায় অচৈতন্য। মাঝে মাঝে আমার নাম ধরে ডাকছেন। আমি কীরকম অপয়া একবার বুঝে দেখ। যাকেই ধরব সেই চলে যাবে। প্লেনে কলকাতায় ফিরছি। বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাছে চাবি রইল। আমি আর আসব না। তোরা যতদিন খুশি থাক। আমার জন্যে মন খারাপ করিস না। ভাগ্যে যা থাকে তাই হয়।'

বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছাত্রাবাসের দোতলায় থাকেন। মধ্যবয়সি পণ্ডিত মিশিরজি। পাকা পেয়ারার মতো গায়ের রং। বেশ হাসি-খুশি। দরদি মানুষ। সুমিতার কথা বলতে বলতে দু'বার চোখ মুছলেন। বললেন, গ্রহ মানতেই হয় এইসব যখন দেখি। কোনো এক পুরুষে কেউ পাপ করে, তার ফল ভোগ করে পরের পুরুষ। ভগবান সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে নেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'রাত্রিবেলা কোথায় খাবে?'

'কাবেরী বললে, 'কোথাও খেয়ে নেব।'

'না, তোমরা আমার হস্টেলে খাবে। সুমিতা তোমাদের দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গেছে। ও আমার মেয়ের মতো।'

খুব যত্ন করে খাওয়ালেন মিশিরজি। প্রেমিক মানুষ। মহাবীরের ভক্ত। কাশীর বিখ্যাত সাধক পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজজির প্রিয় ছাত্র। আনন্দময়ী মার সঙ্গ করেছেন। বেশ ভালো লাগল। আমরা আবার কেদার ঘাটে এসে বসলুম। সাধুদের একটা দল এসেছে। তাঁরা গল্প করছেন। কত রকমের গল্প।

মাঝে মাঝে একসঙ্গে ভজন গাইছেন। এইটুকু বুঝলুম, কাশীর রাত হয় না। তাই না দেশ-বিদেশের মানুষ এখানে ছুটে ছুটে আসেন।

হঠাৎ মনে হল, তাই কাবেরীকে বললুম, 'সুমিতার পাশে গিয়ে কি দাঁড়ানো উচিত?'

কাবেরী একটু ভেবে বললে, 'তুমি তো সব দেখতে পাও। বিমলবাবু কি বাঁচবেন!'

'না। সুমিতার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'তা হলে গিয়ে কোনো লাভ নেই। চারদিক থেকে লোকজন আসতে থাকবে। এইবার তো সব পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে। এই ডামাডোল আমাদের সহ্য হবে না।'

'একটা ব্যাপার তুমি জানো কি?'

'কী?'

'সুমিতা প্রেগন্যান্ট। বিমলবাবুর সন্তান।'

'কী সর্বনাশ!'

পাশাপাশি দুজনে শুয়ে আছি। কাশী শিবপুরী; কিন্তু বেশ গরম জায়গা। পাথর তাপ ছাড়ছে। বাতাস স্তব্ধ। শিবের মতো গম্ভীর রাত। বহু দূরে কোথাও মেঘগর্জনের শব্দ হল। কাবেরী বললে, 'আমাদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে ভালো হয়। কখন কী হয়ে যায়! তোমাকে ছেড়ে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।'

'সেই চালা বাড়িটা দেখতে পাচ্ছ। বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগান। সজনে গাছের ঝিরি ঝিরি পাতা। তুমি নদীতে স্নান করে, ভিজে কাপড়ে, পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে আসছ। আমি দাওয়ায় বসে পুঁথি লিখছি। দূরে একটা চতুষ্পাঠী। ছাত্ররা বেদপাঠ করছে। আমার মা তোমাকে ডাকছেন—সরস্বতী, সরস্বতী।'

'তুমি কত কী দেখতে পাও, আমি পাই না।'

একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। একটা স্বপ্ন দেখলুম। স্বপ্ন না সত্য! সংশয় থেকে গেল। একটা ঘোরের মধ্যে বিছানায় উঠে বসলুম। ক্লান্ত কাবেরী গভীর ঘুমে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে। যেন অন্নপূর্ণা ঘুমোচ্ছে। স্বপ্ন দেখলুম, পাথরের মহাপুরুষ আমাকে ডেকে বলছেন, 'এদিকে আয়।' সামনে গিয়ে প্রণাম

করলুম। আশীর্বাদ করলেন। বললেন, 'আমার পেছন দিকে চলে যা।' নির্দেশ পালন করলুম। আদেশ এল, 'বসে পড়। তাকিয়ে দেখ। বেদির নীচে একটা ছোট্ট খুপরি। বোঝা যায় না। ছোট্ট পাথরের দরজা। প্রথমে একটু চাপ দিয়ে টানলেই খুলে যাবে। ভেতরে জিনিস আছে। বের করে দেখ।'

ছাঁত করে ঘুম ভেঙে গেল।

কাবেরীকে তুলে বসালুম। 'আলো জ্বালো।'

'কেন?'

'প্রশ্ন পরে। ওই মূর্তির ঘরে চলো।'

যা বলেছিলেন, যেমন বলেছিলেন। চাপ দিতেই পাথরের স্ল্যাবটা খুলে গেল। একটা বেশ বড়ো প্রকোষ্ঠ। ভেতরে হাত ঢোকাতে ভয় করছে। অন্ধকার। আলো ঢুকছে না। সাপ থাকলে এতক্ষণে ফোঁস করে উঠত।

কাবেরী আমার পাশে বসে আছে। বললে, 'দেখব কী আছে?'

একে একে বেরল, রুদ্রাক্ষের মালা, স্ফটিকের মালা, তিনখানা পুঁথি, মুখ বন্ধ বাঁশের চোঙ, বাঘছালের আসন।

ভোরের আলো ফুটল। মঙ্গল আরতি শঙ্খ-ঘণ্টা। বেদ পাঠ। এ এক অন্য জগৎ! মা গঙ্গার সুবাস। প্রথমেই বাঁশের চোঙের মুখটা খুললুম। রোল করা একটা কাগজ। হলদেটে। কালির রং বাদামি। ভোরের আলোয় পড়লুম,

'আমি আর ভৈরবী যোগেশ্বরী ত্রৈলঙ্গ বাবার শিষ্য। আমরা দুজনে তাঁর কাছে দীর্ঘদিন সাধন করেছি। বাবার আদেশে যোগেশ্বরী বাংলায় গেল দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণকে সাধন করাতে। সে বৈষ্ণব তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করে বাবার বরে অমর। বাংলা থেকে ফিরে এসে চৌষট্টি যোগিনীতে থাকত। সেখানে সতীমা এক মহা সাধিকা। তাঁর কাছে যোগেশ্বরীর ব্যবহৃত সব জিনিস ও ছবি আছে। সে আছে। চিরকাল থাকবে। দ্বিতীয় শ্রীরামকৃষ্ণের অপেক্ষায় সে ঘুরে বেড়াবে সূক্ষ্ম শরীরে। সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে, স্থূল থেকে নিমেষে সূক্ষ্মে চলে যাওয়ার ক্ষমতা বাবা তাকে দিয়ে গেছেন। ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর থেকে নিষ্প্রান্ত হয়ে যোগেশ্বরী তারকেশ্বরের কাছে এক শিবমন্দিরে অবস্থান করেছিলেন বেশ কিছুদিন। কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। সেই সময় বালানন্দজির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওই মন্দিরে ছিলেন স্বয়ম্ভূলিঙ্গ। স্বয়ম্ভূলিঙ্গের জড় কাশী

পর্যন্ত বিস্তৃত। বছরে একবার শ্রাবণ অমাবস্যায় সেই জায়গায় যোগেশ্বরীর আবির্ভাব হয়। যে দর্শন পায় তার জীবন ঘুরে যায়। সে এক অন্য পৃথিবীর সন্ধান পেয়ে যায়। সাধুসন্তরা এইভাবেই জগৎ রক্ষা করে চলেছেন। তা না হলে জগৎ জন্তুতে ভরে যেত। মানুষের গর্ব করার মতো কিছু থাকত না। যন্ত্র আর সাধন একত্রিত না হলে মানবের পৃথিবী জান্তব হয়ে যায়। তন্ত্রে সেই কারণেই যন্ত্রের ব্যবহার। সাধারণের চোখে মনে হবে সাধারণ জ্যামিতিক রেখা। ত্রিভুজ, বৃত্ত, চতুষ্কোণ। একমাত্র সাধকই জানতে পারেন, ওসব ছবি নয়, আকর্ষণ, আহ্বান। এস, শক্তিরূপিনী মা, তুমি এস। ভূমিতে চতুষ্কোণ একটি আসন পাতার ভাবার্থ কী?' কেউ আসবেন, তার জন্যে পেতেছি আসন। একটি আহ্বান—'আসুন'। ত্রিভুজের অর্থ যোনি। বৃত্ত হল পৃথিবী। ব্যাখ্যা হল—জগতের মধ্যে জগৎ-কারণ অর্থাৎ সৃষ্টি। তন্ত্রসাধন ছাড়া জগতের সম্যক ধারণা সম্ভব নয়। সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম গুরু ভৈরবী যোগেশ্বরী, প্রথম সাধন তন্ত্র।

'এই বাঁশের চোখ ত্রৈলঙ্গ বাবা আমাকে দিয়েছিলেন। যাকে যা দেবার ভরে রাখতেন এইরকম এক একটি আধারে। এই আধারে একটি তুলট কাগজে লেখা ছিল তিরিশটি প্রাথমিক নির্দেশ। নিজের জীবনে গ্রহণ করে সেই কাগজ নিক্ষেপ করেছি গঙ্গাগর্ভে। সেই নির্দেশের কয়েকটি :

১। শাস্ত্র শুধু পাঠ করলেই হয় না, অনুষ্ঠান করতে হয়। যে না করে সে পাপীরও অধম।

২। জিহ্বা সংযত কর, আলস্যই অনর্থের মূল।

৩। ছাদহীন গৃহে যেমন বৃষ্টিধারা পতিত হয়, চিন্তাহীন মনেও সেইরূপ রিপুগণ প্রবেশ করে।

৪। শত্রু শত্রুর যত অনিষ্ট করতে না পারে, কুপথগামী মন তার চেয়েও অধিক অনিষ্ট করে।

৫। চিন্তাশীলতা অমরত্ব লাভের পথ, চিন্তাহীনতা মৃত্যুর পথ।

৬। কামজয়ী হও।

৭। ধর্মাশ্রিত থেকে সমস্ত কাজ কর, তা না হলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

এই আসনটি ভৈরবীর। আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। এই মালা দুটিও

তার। কোটি জপের শক্তি ধারণ করে আছে।

মধ্যরাতে এই আসনটি পেতে রাখবে। তিনি আসবেন। দিব্যলোকের পথ খুলে যাবে।'

মুনশিজির গলা পাওয়া যাচ্ছে। এ দিকেই আসছেন। তাড়াতাড়ি সব ঢুকিয়ে রাখলুম। মুনশিজি এলেন, 'কি, সব ঠিক আছে তো? কোনো অসুবিধে হয়নি?'

'আজ্ঞে না। আচ্ছা চৌষট্টি যোগিনীতে কী ভাবে যাব!'

'অসুবিধে নেই। গঙ্গার ধার ধরে হেঁটে যাও। কাশীর যা কিছু ভালো, সবই তো গঙ্গার ধারে। চৌষট্টি যোগিনী ঘাট। পাশেই মন্দির। পাথরে তৈরি বিশাল এক সিংহ। তোরণ, মহল্লা। সাধিকাদের জায়গা। রাতের দিকে ভয় ভয় করে। মা কালী তাঁর চৌষট্টি যোগিনীকে নিয়ে রাজত্ব করছেন।'

অদ্ভুত ভাবে জায়গাটা পেয়ে গেলুম। ছোট্ট একটি মেয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। গলির পর গলি। হঠাৎ এক ঝলক আলো। তলায় বইছে গঙ্গা। আহা, কি পবিত্র স্থান! সতীমা দেহ ছেড়ে গেছেন, আছেন পবিত্রা মা। ছ'ফুট লম্বা। পাথর কোঁদা শরীর। হাত দুটো হাঁটুর কাছে। এলোচুল কোমর ছাপিয়ে গেছে। দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। দেখেই বললেন, 'এসেছিস! আসছিস দেখে মেয়েটাকে পাঠালুম।'

'সে কোথায়?'

'নেই। এসেছিল, চলে গেল। বাজে কথা থাক। যা যা পেয়েছ সব নিয়ে সন্ধে সাতটার সময় আসবে। তখন কথা হবে। এখন যাও।'

বাইরে এসে কাবেরী বললে, 'কী ভীষণ ব্যক্তিত্ব! আমার মতো কড়া ধাতের মেয়েরও ভয় করছিল।'

ফেরার পথে কেদারজেঠুর খবর নিতে গিয়ে শুনলুম, 'চলে গেছেন।'

আশ্চর্য ব্যাপার। মানুষটার আরও অনেক গোপন দিক আছে।

সন্ধে ছ'টা। সেই গোপন খুপরি থেকে সব বের করে নিয়ে পবিত্রা মাতার আশ্রমে এলুম। সব কেমন যেন থমথমে। মা আসনে বসে আছেন লম্বা হয়ে। ঘরে হোমের গন্ধ। সব জিনিস তাঁকে দিলুম। দেখতে দেখতে তাঁর চোখে জল এল। একটা চাবি হাতে দিয়ে বললেন, 'ওই দরজাটা খোল।'

সেই ঘর। হয় তো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই ঘরেই এসেছিলেন। পবিত্রা মা বললেন, 'উত্তর মুখে আসন পাত।' একটি পাথরের থালায় সেই দুটি জপের মালা। বড় একটি প্রদীপ।

'যাও স্নান করে এস।'

রাতের গঙ্গায় স্নান সেরে এসে, শুদ্ধ-বস্ত্র পরিধান। 'আসনের দক্ষিণ মুখে দুজনে পাশাপাশি বস। ধ্যান কর। রাত বারোটায় মা আসবেন। অন্য কোনো দিকে তাকাবে না। মনে মনে অনবরত বলতে থাক, মা, মা, মা। দরজা বন্ধ হল।'—
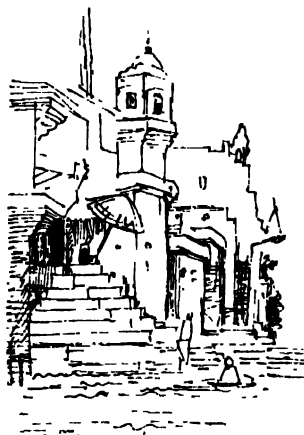
অন্য মানুষ

যার আত্মাই নেই সে লিখবে আত্মজীবনী।

ইডিয়েট! আত্মা মানে সেল্‌ফ, মানে তুমি। তোমার জীবনী।

তুমিটা কে?

মরেছে রে! ফ্যামিলির পাগলামিটা ভেতরে বাসা বেঁধে বসে আছে!

তাহলে সেই গানটা গাই,

যার পিতা-মাতা বদ্ধ পাগল

ভালো কি হয় মা তাদের ছেলে!

এই রকম শুনেছি, ছেলে হয়েছে শুনে আমার বাবা সদ্যোজাত আমাকে নিয়ে লোফালুফি খেলেছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে আমি ঘরের কড়িকাঠের দিকে উঠে যাচ্ছি, কাঁদতে কাঁদতে ঝপাং করে তাঁর হাতে এসে পড়ছি। এই দৃশ্য দেখে আমার দাদু ভয়ে অজ্ঞান। জল-বাতাস করায় জ্ঞান ফিরে আসামাত্রই বললেন—আছে না গেছে! আমি তখন মায়ের কোলের কাছে ছোট্ট একটা পুঁটলি। বাবা তখন বাগানে কলার কাঁদি নামাচ্ছেন। বিশাল কাঁদিটা বেলতলায় রেখে হাঁক পাড়লেন—এস, এস! বাইশটা হনুমান। বাবা বীর হনুমান বললেন, মহাবীর! তিনি এলেন। আর ঠিক সেই সময় রাধা-গোবিন্দর মন্দিরে বেজে উঠল আরতির শঙ্খঘণ্টা। এই তো, এই তো, আত্মজীবনী শুরু হয়ে গেছে। তারপর কী হল?

আমি একটু একটু করে বড় হতে লাগলুম। গ্রামের মানুষ, পরিচিতজনেরা বলতে লাগল, ধেড়ে হচ্ছি।

তুমি শুনতে পেলে?

না। শুনতে পেলেও বুঝতে পারলুম না ; কারণ তখন আমার বোধ-বুদ্ধি পরিষ্কার হয়নি। দিবা-রাত্র চিল চিৎকার করি। আমার চিৎকারে বাড়ির লোক অতিষ্ঠ।

কিছু কিছু বাচ্চা কাঁদুনে হয়, সে আর কি করা যাবে! সে-কান্না কি এখনো আছে?

বাইরে নেই। ভেতরে আছে। ভেতরে বসে কে যেন সদাসর্বদা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

একটা বিয়ে করে ফেল।

একটা কি? আর একটা বিয়ে করার সময় এসে গেল।

সে আবার কি? দু'বার বিয়ে করা তো অপরাধ!

সে পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে। ডিভোর্স পেয়ে গেছি।

দ্বিতীয়টি কে?

বউ পাল্টালেও শ্বশুরবাড়ি পাল্টাচ্ছে না।

কেসটা কী? এটা তো মনে হচ্ছে তোমার আত্মজীবনীর একটা আকর্ষণীয় অংশ হতে পারে। সাংঘাতিক সাংঘাতিক ঘটনা ছাড়া আত্মজীবনীর দাঁত তৈরি হয় না। পাঠককে আঁচড়াবে, কামড়াবে, আখের মতো চিবোবে। ঘটনাটা বেশ করে বল।

আমি বড় বোনকে বিয়ে করলুম।

কী ভাবে করলে? প্রেম না সম্বন্ধ?

তখন সমাজ জীবনে অল্প-স্বল্প প্রেম উঁকি মারছে। সুন্দরী মেয়েদের দিকে যে-কোনো যুবকের চোখ চলে যেতেই পারে।

চোখ যদি কম দেখে তাহলে চশমা পরবে। গাছের আড়াল, থামের আড়াল থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখবে। যে-কোনো ছুতোয় তার আসা-যাওয়ার পথের ধারে বাঁকা শ্যাম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। একে বলে 'শ্রীমতী সিন্ড্রোম'। জ্বরজারি নয় শ্রীমতী সংক্রমণ। এক ধরনের 'ভাইরাস'—বি-হেপাটাইটিস, ম্যানেনজাইটিস, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। ছেলেটা কেমন যেন হয়ে যাবে। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে একটা মুখ। যার চোখ আকাশের মতো নীল। ঝিনুকের মতো কপাল। তিল ফুলের মতো নাক। কবিতার মতো চলন। বাতাসের মতো শাড়ির আঁচল। পদ্মের মতো গন্ধ। 'ফেটাল অ্যাট্রাকশান'। বাপ, মা, ভাই, বোন সব অদৃশ্য। ওরা আবার কে?

ঘটনায় এস। ঝুলে যাচ্ছে।

ঝুলতেই তো গিয়েছিলুম, ঝুলনে নয় দড়িতে। বোমার মতো চার-ছ লাইন কবিতা হড়াস করে বেরিয়ে এল,

> তুচ্ছ এই জীবন
> অর্থহীন এই বেঁচে থাকা।
> হাত আছে স্পর্শ নেই
> জিভ আছে স্বাদ নেই।

থামের মতো দাঁড়িয়ে আছি
গোদা শ্রীচরণ॥

কবিতাটা কি হল?

মনের কবিতা মনেই রইল! অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসে গেল। চাকরি। ভালো চাকরি। 'রেসপেকটেব্‌ল'। চেয়ারের পেছনে সাদা তোয়ালে। কাচ ঢাকা টেবল। বেয়ারা ডাকার ঘণ্টা। ফোন। চেম্বারের বাইরে নেমপ্লেট। মানুষ গোনার চাকরি। অনেক মানুষে এই মানুষটা হারিয়ে গেল। প্রেমের টায়ার পাংচার।

প্রেম আর কাচের গেলাসে বিশেষ তফাত নেই।

তুলনাটা ঠিক হল না। প্রেম হল টেনিস বল। খালি লাফায়। প্রেম হল পাতকো। যৌবনে অসাবধানী পড়ে যায়। তারপর চাকরির দড়ি ধরে উঠে আসে। প্রেম উবে যাওয়ার পর পড়ে থাকে আদি-অকৃত্রিম কাম। কামের শেওলা হল প্রেম।

আবার 'থিয়োরি'!

একটু এসে যাচ্ছে। একে বলে 'সেলফ্ অ্যানালিসিস'—আত্মবিশ্লেষণ।

ওসব ছেড়ে গল্পে এস।

গেজেটেড চাকরি। চোখে চশমা, মুখ গম্ভীর। পদে পদমর্যাদা। বেশ ভারী জুতো। খটাখট্ শব্দ। গাড়ি আসে কাজে যাই। গাড়ি আসে কাজ থেকে ফিরে আসি। বেশ বুঝতে পারি ভেতরে কি একটা বেশ বড় হচ্ছে। সেটা হল আমার অহংকার। তখন যা হল, তা কি অদ্ভুত! আমার সেই একদা আকর্ষণটিকে আমার দিকে এগিয়ে দেওয়া হল। প্রেমিকা হল পাত্রী, আমি হলুম পাত্র। সে আরও সুন্দরী হয়েছে। আমি হয়েছি মোটা। গ্রাম্য ভাষায় ধুম্‌সো। মুখের ধার মেদে গোলাকার। ভুঁড়ি বেড়েছে। কিঞ্চিৎ থপথপে। সেকালের সম্বন্ধের বিয়েতে মেয়েদের 'চয়েস' থাকত না।

ফাল্‌গুনে বিয়েটা হয়ে গেল যথেষ্ট ঘটা করে। পিতামহ ছিলেন ধনী এবং শিক্ষিত। ছড়ি হাতে মর্নিংওয়াক। রোজ একটি করে রুই মাছের মুড়ো। দেড় সের দুধ। স্নানের আগে দলাই মলাই। কিন্তু 'ভেরি ফ্রেন্ডলি'। যা-কিছু গোলমাল ঠাকুমার সঙ্গে। তিনি খুব একটা পাত্তা দিতেন না। জমিদারের মেয়ে রাঙা টুকটকে। পাঁচ হাজার টাকার জামদানি পরে শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন। পেছনে পঞ্চাশটা লোক তত্ত্ব সাজিয়ে আনছে। সাদা একটা ভাগলপুরি গোরু। জামাই দুধ খাবে। পিতামহ রোজ পাঁচশো ডন, এক হাজার বৈঠক দিতেন।

মুগুর ভাঁজতেন। মহাবীরের মন্দির। আড়াই মণ ওজনের পাথর দু'হাত দিয়ে মাথায় তুলতেন। শিক্ষিত পালোয়ান। এক ঘণ্টায় একশোটা অঙ্ক কষতে পারতেন। একমাইল দূরের শব্দও শুনতে পেতেন। আকাশের শেষ তারাটাও চোখে পড়ত।

পিতামহের কথা বলে কী লাভ?

বাঃ, হেরিটেজ! পতনের কাহিনি। হাতিরা কেমন করে ছুঁচো হয়ে গেল। ভরনের কাঁসার বাসনকোসন থেকে স্টেনলেস স্টিল। মানুষগুলো সব ছোট ছোট হয়ে গেল। চকমেলান বাড়ি থেকে ঘুপচি ঘাপচি ফ্ল্যাট। বাগান থেকে সাত ইঞ্চি ফুলগাছের টব। ঠাকুরদার খাটে তিন পাট ওল্টাবার পরেও তিন হাত জায়গা।

বারো মাসে তেরো পার্বণ। দোল, দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি। হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে। সারা বছরই বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন গিজগিজ করছে। রাতে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচির গন্ধে বাড়ি ম-ম করছে। এবেলা, ওবেলা ছত্রিশ পদ রান্না হচ্ছে। খরচের কোনো হিসেব নেই।

উড়তে উড়তে, ওড়াতে ওড়াতে ডানা ভেঙে গেল। লাল টুকটুকে ঠাকুরদা হাঁপানিতে হাপরের মতো শ্বাস টানতে টানতে—'মা' বলে চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলেন। 'সংসারে ঘেন্না ধরে গেল', বলে ঠাকুমা কাশী চলে গেলেন। বাবা শক্ত হাতে হাত ধরলেন। জ্ঞাতি-গুষ্টি আর সুবিধে হবে না দেখে পালিয়ে গেলেন। বাড়ি ফাঁকা। কোর্টে মামলা চড়ল। বিষয়ের ভাগাভাগি নিয়ে যত ঝামেলা।

বাবা ডাক্তার হলেন। ধ্যাত্তেরিকা বলে কলকাতায় চলে এলেন। মা বললেন, 'আমাদের ভাগ?' বাবা বললেন, 'তোমাকে হাজার পঞ্চাশ নতুন ইট কিনে দেব।' দেশের বাড়ি থেকে খবর এল, ঠাকুরদা ভূত হয়ে গভীর রাতে দরজা খুলে দিচ্ছেন, জানলা খুলে দিচ্ছেন। ছড়ি হাতে সারা ছাদে ঠকঠক করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। টেবিল-চেয়ার টানাটানি করছেন। এজলাসে হাকিম ওই ভিটের মামলার দস্তাবেজ খুললেই একটা হিম-বাতাস কানের কাছে অনবরতই ফিস্‌ফিস্ করে বলতে থাকে—'হাকিমের পো ঘাড় মটকে দেব।' হাকিম বদলি নিলেন। আর এক হাকিম এলেন, বদলি নিলেন। আর এক...

স্টপ্, স্টপ্। এই করে চার পাতা হজম করার তালে আছ! স্ট্রেট্, স্ট্রেট্, ন্যাশনাল হাইওয়ে।

আমার জীবনের বিলকুল আঁকাবাঁকা।

মামলার কী হল?

পড়ে আছে।

ভিটে?

পড়ে আছে।

এগোচ্ছেটা কী?

সময় আর আগাছা। ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল। ভালো ভালো সাপ। সুন্দর সুন্দর পাখি। কাঠবেড়ালী। একটা বাইনোকুলার কিনেছি। উই এন্ডে গিয়ে পাখি দেখি! অদূরেই মাসির বাড়ি। ভীষণ ভালো রান্না। খিচুড়ি, বেগুনি। নিরিবিলি ঘর। একচিলতে দিবা-নিদ্রা। মাথার দিকে জানলা। তিত্তিরে ঝিলের জল। মিঠে বাতাস। হালকা ঘুম।

—আটকে গেছ।

—মানে?

—বেরোবে কী করে?

—কেন? সোমবার এলেই বেরিয়ে পড়ব। জীবন ও জীবিকা। লোকাল ট্রেনে কলকাতা। ভেড়ার চালান। রোগা-মোটা। পায়ে পায়ে, গায়ে গায়ে, ঢলাঢলি, চটকাচটকি। সবাই চলেছে। কেউ চলেছে ঘুষ নিতে, কেউ চলেছে খেটে মরতে, কেউ চলেছে মুরগি ধরতে।

> ধান্দা, বান্দা, সাধু আর শয়তান জীবনে ছন্দে গীতবিতান।
> ঢ্যালা ঢ্যালা লোভী চোখে পৃথিবীটা খাদ্য।
> আধমরা ঘোলা চোখে মৃত্যুর বাদ্য।

—ব্যাড হ্যাবিট।

—কোনটা?

—কবিতা। এই করেই বাঙালি ফেঁসে গেল।

তোমার পিতার পরিচয়ে একটু অসংগতি দেখা যাচ্ছে। একটু গ্রাম্যভাব। তোমাকে ওপর দিকে ছুড়ে দিয়ে লুফে নিচ্ছেন, হনুমানকে কলা খাওয়াচ্ছেন, আবার ডাক্তার হয়ে কলকাতায় প্র্যাকটিস করছেন!

—কোনো অসংগতি নেই। আমাদের পরিবারে অল্প-স্বল্প পাগলামির বীজ ছিল। পাগল না হলে জিনিয়াস হয় না। ইংরেজরা সেইরকম বলেন। বইও আছে—'জিনিয়াস অ্যান্ড ইনস্যানিটি'। বাবা ব্যায়াম ভালোবাসতেন। মেধাবী।

ডাক্তারি পরীক্ষায় ভালো ফল করেছিলেন। রসিক ডাক্তার। প্রচণ্ড হাতযশ। রোরিং প্র্যাকটিস। টাকার লোভ ছিল না। মহাবীরের ভক্ত। বক্সিং করতেন। আমার মায়ের একটা কথাও শুনতেন না, কিন্তু ভীষণ ভালোবাসতেন। নিজের মাকে বলতেন, জগজ্জননী। কাশী থেকে ফিরিয়ে এনে পূজার আসনে বসিয়েছিলেন। মেয়েদের চিকিৎসা করতেন বিনা পয়সায়। রোজগারের চেয়ে খরচ বেশি। ফলে, আমরা কোনোদিন ঢাউস বড়লোক হতে পারিনি।

—স্টপ। নিজের কথা বল। ঘটনা বল ঘটনা। গুড়ের ওপর মাছির মতো ভ্যান ভ্যান কর না!

—প্রথম ঘটনা, আমি ঠিক কে জানি না।

—এই রে আবার দর্শন।

—দর্শন নয়, ফ্যাক্ট। আমি মরে গেলুম। ডিক্লেয়ার্ড ডেড। ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হচ্ছে। হঠাৎ উঠে বসে জানতে চাইলুম, আমার চশমা কোথায়? ডাক্তারবাবু অজ্ঞান হয়ে গেলেন। চশমা? মা বললেন, চশমা আবার কী? তুই আবার কবে চশমা নিলি?

—ইন্টারেস্টিং।

—এখনো কিছুই হয়নি। অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। ডাক্তারবাবু হাসপাতালে। একটু জ্ঞান এসেছিল। ভূ-ভূ করে সেই যে জ্ঞান হারালেন, সে-জ্ঞান আর ফিরল না। বিছানা ছেড়ে মেঝেতে দাঁড়ালুম, হাইট এক ইঞ্চি বেড়ে গেছে। পা বড় হয়ে গেছে। চটিতে পা ঢুকছে না। গলার স্বর ভারি। যখন জিজ্ঞেস করলুম, আপনারা কারা? আমার মামা কোথায়? সবাই ডুকরে কেঁদে উঠল। কে একজন কাঁদতে কাঁদতে বললে, এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো ছিল।

—আমার মনে হয়, তুমি বানাচ্ছ।

—এত সন্দেহ করলে আত্মজীবনী লেখা যায় না।

—ঠিক আছে। বল, বল।

—সবাই কিরকম ভয়ের চোখে তাকাতে লাগল। একজন ওঝা এসে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দিলেন। সে মরে গেছে। আকাশপথে অনেক আত্মা এদিক-ওদিক করে। হঠাৎ একটা, খালি দেহ পেয়ে ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়েছে। ভোগ বাকি ছিল। আমি মেরেধরে তাড়িয়ে দিতে পারি, ফকিরের কৃপায় সে-ক্ষমতা আমার আছে, তাহলে এ কিন্তু মরে যাবে। কে যেন বললে, সেটা ঠিক হবে না। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। আমরা শিখিয়ে পড়িয়ে

ট্রেনিং দিয়ে ঠিক করে নেব। এখন দেখতে হবে কোন ব্যাটা ঢুকেছে, বিহারি, বাঙালি, মাড়ওয়ারি? ওঝা বললেন, বাঙালি এলাকায় বাঙালিই ঢুকবে। ওঝা ভয় দেখিয়ে গেলেন, এ কিন্তু যে-কোনো দিন মরে যেতে পারে। যে এসেছে সে তো অতিথি। তবে লোকটা ভালো। মদটদ খায়নি কোনোদিন। মেয়ে রোগ ছিল না। কে বললে, 'যে-আত্মাটা ঢুকেছে তার বয়েস কত?' ওঝা বললেন, 'আশির কম নয়! ফাটা-ফুটি আছে। পুরানো মাল। হাঁপানিতে মরেছে। মালকড়ি ছিল। বউটা চরিত্রহীন। ছেলেপুলে ছিল না। দুটো বিয়ে। বংশরক্ষা হল না। তবে এই দেহে আত্মাটা ঠিক মতো ফিট করেনি। সাইজে বড়। টাইট হয়ে আছে। ঠেসেঠুসে ঢুকেছে। তবে আত্মা তো সলিড নয়। নরম নরম, থলথলে। থাকতে থাকতে দেহের ভেতরের উত্তাপে গলে যাবে। মোমবাতির মতো। জ্বলবে আর গলবে ; তারপরে ভ্যানিস।'

—এই সব রাবিশ তুমি বিশ্বাস করলে?

—আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি যায় আসে! লোকের বিশ্বাস! বাড়ির সবাই 'আপনি, আপনি' করতে লাগল। 'আপনি খেতে বসুন', 'এই নিন আপনার চা'! বউ-এর গায়ে হাত দিতেই ছিটকে সরে গেল—'ছি ছি, এ কি করছেন, এ কি করছেন!' যেন পরস্ত্রী। মাকে একদিন বলছে, কানে এল, 'মা, আমি তো বিধবা হয়েছি!' মা বললে, 'সে কিরকম? জলজ্যান্ত বেঁচে আছে।' 'সে থাকতে পারে। এ অন্য লোক। ভাড়াটে হয়ে এসেছে। জবর দখল। সে ডানপাশ ফিরে শুত। এ বাঁপাশ ফিরে শোয়। এর নাক ডাকে। ওর নাক ডাকত না। খোঁচা খোঁচা গোঁফ গজিয়েছে। মুখটা পাকা নোনা। ঢ্যাবলা ঢ্যাবলা চোখ। আপনার ছেলে শুয়ে শুয়ে কত গল্প করত। আর এ? শুল কি ঘুমল।' মা বলল, 'পুরুষ মানুষের গোঁফ-দাড়িই শোভা।' বউ বললে, 'এ তো খ্যাংরা গুঁফো!' মা বললে 'শ্রাদ্ধ না হলে বিধবা হওয়া যায় না। তুমি কি নতুন আইন তৈরি করতে চাও?'

—তুমি কি 'জাল প্রতাপচাঁদ' বা 'ভ্রান্তিবিলাস' জাতীয় কোনো বই পড়েছ?

—সে অনেক আগে। ছাত্রজীবনে।

—এ তারই প্রভাব। তুমি যে মরেছিলে, কী অসুখে?

—ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। বেতলা ফরেস্ট থেকে ধরিয়ে এসেছিলুম।

—সেখানে কী করতে গিয়েছিলে?

—হনিমুনে। আমি আর আমরা ভায়রা। আর দুই বোন।

—বোন বুঝি, দুই বোনটা কী?

—দুই বোনের একসঙ্গে বিয়ে হয়েছিল একই ছাঁদনাতলায়। যমজ বোন। একেবারে একই রকম দেখতে। এই জায়গাটায় এমন 'মিক্স আপ' যে আমারই মাথা খারাপ হয়ে যায়।

—কিরকম?

—সে তো আর এক কাহিনি।

—ওটা আর বাকি থাকে কেন? বলে ফেল।

—জয় গুরু বলে শুরু করি?

—করে ফেল।

—সরলা আর রমলা দুই বোন। ঠিক আছে?

—ঠিক আছে।

—দুজনেই সমান চাপা সুন্দরী।

—চাপা সুন্দরী মানে?

—দু' ধরনের সুন্দরী এ-কালে দেখা যায়। খোলা সুন্দরী আর চাপা সুন্দরী। যেমন খোলা খাবার আর ঢাকা খাবার।

—সাবধান। কিনারায় চলে এসেছ। খারাপ দিকে চলে যেতে চাইছ। নারী কি খাদ্য?

—নারী কি অখাদ্য? সুন্দর বলেই না নারী! সৌন্দর্যের বিচারে পুরুষরা নারীর পাশে দাঁড়াতে পারবে? দামড়ার দল। মেয়েরা কৃপা করে জীবনসঙ্গিনী হতে আসে। কিছুদিনের মধ্যেই পুরুষ ব্যাটা হয় বলদ, না হয় ভারবাহী গর্দভ। সেকালে কি হত, পালকির ভেতর সুন্দরী আর দুটো কুৎসিত ষণ্ডামার্কা লোক বহন করে নিয়ে যাচ্ছে—হুম হুম না, হুম হুম না। মাঝে মাঝে কাঁধ থেকে গামছা টেনে শরীরের ঘাম মুছছে। খানাখন্দ পেরিয়ে চলেছে, চলেছে। মর্কট মার্কা জমিদার কাছা-কোঁচায় জড়ামড়ি করে সুন্দরী নর্তকীর শ্রীচরণে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, ওদিকে জমিদারি নিলামে চড়ছে। মহিষাসুরের অবস্থা দেখে করুণা হয়। মায়ের পায়ের কাছে অত বড় একটা বীর চিরকালের মতো গেড়ে গেছে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে দুর্গা মায়ের রূপের দিকে। যুদ্ধ করতে ভুলে গেছে। সিংহ আধসের মাংস খাবলে নিয়েছে। আবার বলছে কি? তোমার প্রেমে পড়েছি—মার, মার, খণ্ড খণ্ড কর। দুনিয়া দেখুক। ফলটা কি হল? মহিষাসুর মায়ের পায়ের কাছে ওই ভাবেই রয়ে গেল, ফ্রিজ শট। এখন

আমরা দুজনকেই টেনে এনে প্যান্ডেলে, প্যান্ডেলে পুজো করি। মা যে একটু সোজা হয়ে সুস্থভাবে দাঁড়াবেন সে উপায় নেই। পায়ের কাছটা কোনোদিনই ক্লিয়ার হবে না। মায়ের পায়ে ডিঙি মেরে ফুল দিতে হবে। মাকে নিচু হয়ে প্রণাম করব কি পালোয়ানটা দাঁত বের করে বসে আছে, যেন মায়ের সিকিউরিটি গার্ড। আচ্ছা, মাথামোটা অসুরটার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, বাবা ভোলানাথের কাণ্ডটা দেখুন। চিৎ হয়ে পড়ে আছেন ; আর জাঁতার মতো বুকের ওপর 'পোজ' নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মা কালী। ওই ভাবেই থাকবেন। নামার কোনো 'চান্‌স' নেই। পুরুষ জাতির 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্যে রামপ্রসাদ শেষে লিখতে বাধ্য হলেন—

শিব নয় মায়ের পদতলে।
ওটা মিথ্যা লোকে বলে॥
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে,
মা দাঁড়ায়ে তার উপরে,
মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ
শিবরূপ হয় রণস্থলে॥

আর নজরুল সাহেব লিখলেন—'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যারে আলোর নাচন।'

—দেখ, সামান্য একটা প্রশ্নের উত্তরে তুমি যদি এক মাইল লেকচার দাও, তাহলে তো মহাযন্ত্রণা।

—আমার জীবনযন্ত্রণা প্রকাশ করতে হলে অনন্তকালেও শেষ হবে না।

—তুমি ওদিক থেকে সরে এসে সুন্দরীর কথা বল।

—সুন্দরী? লজ্জা পাবেন না তো! মুখ আরক্তিম হবে না তো? সহ্য করতে পারবেন তো?

—আহা! বলই না। সহ্য করতে না পারলে শুয়ে পড়ব।

—পুরাণে ঢুকছি। বিকটাকার রাবণ। কুটিরে সীতাকে দেখেছেন। প্রথম দর্শন। দশটি মাথাই ঘুরছে। ঘুরে গেছে। বিড়বিড় করে বকছে। এখানে একটা রহস্য আমি ফাঁক করে দিতে চাই। চিচিং ফাঁক। আগে এই স্কেচটা দেখতে হবে—রাবণ রাজার দশটা মাথা। আসলে এটা একটা 'মাল্টি স্টিরিও স্পিকার সিস্টেম'। মাঝেরটা প্লেয়ার, দুপাশের ন'টা হল স্পিকার। ব্যস, ট্রেব্‌ল, উফার, হুইসপার, ইকো, সুপার, ডুপার, মেলো, ট্রেলো, থাভ্‌। রাবণ একটা হোম

থিয়েটার ঘাড়ে নিয়ে ঘুরতেন। রাবণের 'অরিজিনাল ভয়েসটা' ছিল সরু মিনমিনে। দশটা চ্যানেল দিয়ে 'বুস্টার' মারফত যখন বেরতো, বুফার, উফার, ইকো, ট্রেলার, আকাশ-বাতাস কম্পিত। তখন লোকে বলত, কে রে বাপ্! বজ্রনাদ। যখন কথা বলতেন না, তখন একটা 'থিম মিউজিক' বেজেই যেত। ওদের ভাষায়। হিড়িম্বা ডায়ালেক্ট।

লিংকা লিংকা লিকলেট।
আমেরিকাং চিকলেট॥
ইন্ডি ইন্ডি ইডিয়েট।
লিকপিক্ লিকপিক্ টিকটেক্॥

—দাঁড়াও দাঁড়াও, এর মানেটা কি?

—পাথরটা সমুদ্রের জল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। লংকা 'প্যালেসের' টুকরো। সেই পাথরটার গায়ে এই স্ক্রিপ্ট। গীতিকার, সুরকার—মেঘনাদ। আমেরিকা চিকলেট বের করার ঢের আগেই লঙ্কা লিকলেট বের করার ফেলেছিল। ইন্ডিয়ানরা ইডিয়েট। লিকলিকে টিকটিকি। এ রামকে উদ্দেশ করে বলা। লঙ্কা তো সোনা দিয়ে তৈরি—স্বর্ণলঙ্কা। সেই সোনা আমেরিকায় গিয়ে ডলার হল। রাবণ হেলিকপ্টার, গাইডেড মিসাইল, ছোট সাইজের অ্যাটম বোমা, আরও নানা রকম সামরিক অস্ত্রশস্ত্র করে ফেলেছিলেন। সীতাকে ভালোবেসে না ফেললে রামচন্দ্রের প্রাণ বাঁচার উপায় ছিল না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল রাজায় রাজায়। মধ্যস্থতা করেছিলেন দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ। রামচন্দ্র তো অযোধ্যা থেকে কিছুই পাননি। সম্বল ধনুর্বাণ। সাথি—নাবালক লক্ষ্মণ। সামান্য একটা দায়িত্ব—সীতাকে কিছুক্ষণের জন্যে পাহারা দেওয়া। পারলেন না। দশাননের স্ট্র্যাটেজির কাছে হার স্বীকার। রামচন্দ্রেরও মতিভ্রম। হরিণ কি সোনার হতে পারে? তিনি কি জানতেন না! আর সীতার লোভ! চিরকালের নারীর লোভ। সোনা।

—কত দূর গেছ, খেয়াল আছে? হচ্ছিল সুন্দরীদের কথা।

—এই তো! সেই কথাতেই আসছি। সীতাকে দেখে রাবণের প্রথম উক্তিই হল—ও সুন্দরী তুমি কে? সীতার সামনেই সীতার রূপবর্ণনা। কাম-জর্জরিত দানব! তন্ত্রসাধনা করতেন। তোমার গায়ের রং সোনার মতো—কাঞ্চন বর্ণাভ। পদ্মের মতো ফুটে আছ। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে—তুমি লক্ষ্মী, অপ্সরা অথবা রতি। দাঁত যেন মুক্তার মালা। টানা টানা দুটি চোখ, ধারে ধারে

লালের আভা। সুডৌল নিতম্ব কত প্রশস্ত! তোমার কোল যেন তুলোর বালিশ, যেন হাতির শুঁড়। আহা! তোমার বুক দুটি, মরি মরি! নিটোল গোল, একেবারে ঠাস, সুউচ্চ, সমুন্নত, বিউটিফুল, লাভলি, যেন দুটি তাল। কে তুমি সুন্দরী!

—তুমি কিন্তু সেক্সের দিকে চ্‌লে যাচ্ছ।

—আমি কোথায় গেলুম। গেল তো রাবণ। সীতাকে হেলিকপ্টারে তুলে লংকায় পালাল। আপনি সামান্য দেহবর্ণনায় উতলা হচ্ছেন? আমাদের পুরাণগুলো উল্টে-পাল্টে দেখবেন। রাবণ তো রম্ভাকে দেখেও পাগল হয়ে গিয়েছিল। যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ। দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা করছেন। উর্বশী, মাধবী, তিলোত্তমা। কী করা যাবে! মেয়েরা এইভাবেই ছেলেদের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। এর নাম 'ফেটাল অ্যাট্রাকশান।'

—তা তোমার সমস্যাটা কী হল?

—আমি বউ মনে করে শালীকে বিয়ে করে বসলুম।

—সে আবার কি?

—মিক্স আপ।

—মিক্স আপ মানে?

—এটা মনে হয় ভগবানেরই ইচ্ছে। বিয়ের পর বউয়ের চেয়ে শালীকেই ভালো লাগে। ঠিক কি-না?

—তা একটু বটে। রোমান্টিক। বউরা ভীষণ শাসন করে। কথা শোনে না। প্রেম বোঝে না। কেবল স্বার্থ, স্বার্থ, স্বার্থ। এই করলে না, ওই হল না! বেশি খরচ কোরো না! টাকা আমার হাতে দেবে। টিপে টিপে ছাড়বে। ভিকিরির দশা।

—আমি লাকি!

—কীসের লাকি? এই তো বললে ডিভোর্স হয়ে গেল।

—আরে মশাই, আমার ম্যারেজটা তো ডিভোর্স দিয়েই শুরু হল।

—কী যে গোলমেলে ব্যাপার! বুঝিয়ে বল।

—প্যাঁ পোঁ সানাই বাজছে। একই জায়গায় দুই বোনের বিয়ে। বিরাট সামিয়ানা। ফুল, পাতা! চড়া চড়া আলো। গিজগিজ করছে লোক। দু' তরফের বরযাত্রীর দল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ফুসফুস সিগারেট টানছে। বরসভায় আমরা দুটো বর সামান্য ব্যবধানে বসে আছি। ভায়রাটাকে মনে হল বেশ অহংকারী।

নিজের বন্ধুদের সঙ্গে রেডিও-গলায় চালের কথা কইছে।

—রেডিও-গলা মানে?

—আকাশবাণী, কলকাতা।

—বুঝেছি, হাঁড়ির ভেতর মুখ ঢুকিয়ে যেমন বলে। তা চালের কথা মানে? চালের ব্যবসা করে?

—না, না, বড় বড় কথা। ফান্টুস মার্কা। ইউরিয়ার মতো অহংকার।

—সে আবার কী?

—ইউরিয়া খুব বেড়ে গেলে চামড়া দিয়ে ফেটে ফেটে বেরোয়।

—তারা মানে লোকটা সুবিধের নয়।

—গুণ্ডামার্কা। খুনটুন করে থাকতে পারে। মদ তো খায়ই; তা না হলে অমন চেহারা হয় না। ভ্যাড় ভ্যাড় করে বকেই যাচ্ছে। যে-সব বন্ধুরা বরযাত্রী হয়ে এসেছে, তাদের নামও অদ্ভুত। একজনের নাম, টুপাইস। আর একজনের নাম মাচা। আর একজনের নাম দম্বল। অসহ্য। পাশেই গঙ্গা। আমি আর আমার বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে গঙ্গার ধারে চলে গেলুম। শান্তি। পাশেই পারঘাট। একবার মনে হল, বিয়ে করে দরকার নেই। ওপারে চলে যাই। এত লোক, কে যে কী করছে! এ চেল্লাচ্ছে, ও ধমকাচ্ছে। সবাই ব্যস্ত। হঠাৎ একজন এসে খুব মেজাজ দেখিয়ে বললে, আড্ডা মারা হচ্ছে! বিয়েটা কে করবে? আমার বন্ধু সুজয় ছাত্র রাজনীতি করে। লোকটার কলার চেপে ধরে বললে, ছুঁড়ে গঙ্গার জলে ফেলে দেব। ম্যানারস জান না। বর নিয়ে চলে যাব। লোকটি হনহন করে বাড়ির দিকে চলে গেল, ফিরে এল চার-পাঁচটা ছেলে নিয়ে। তারা বলতে লাগল, ক্যা ক্যা ক্যা, পাঞ্জাবি খামচেছে কোন শ্লা! সব কটার মুখ দিয়েই হুইস্কির গন্ধ বেরোচ্ছে। সুজয়ের ভয়-ডর নেই। কলেজে এই রকম মারামারি সে অনেক করেছে। মাতালদের ফ্ল্যাট করতে বেশি সময় লাগে না। সুজয় কি একটা করল, ছটা ছ'দিকে ছিটকে পড়ল। একপাশে গোটাকতক কুকুর এঁটো পাতার দখলদারি নিয়ে অশান্তি করছিল। একটা গিয়ে পড়েছে তাদের ঘাড়ে। দক্ষযজ্ঞ। এর মধ্যে কে একজন চেল্লাতে লাগল—ডাকাত, ডাকাত! আর ঠিক সেই সময় সারা বাড়ির আলো ফিউজ। সানাইঅলা সানাই বগলে ছুটছে। বাড়ির ছাদে উঠে মেজকর্তা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতেই চারপাশের গাছে গাছে যত কাক ছিল কা কা করে উড়তে লাগল। ওদিকে বড় রাস্তায় ঘোড়ায় চেপে রাজস্থানি বর যাচ্ছে। ঢ্যাম ঢ্যাম করে ব্যান্ড বাজছে।

অন্ধকারে হঠাৎ একটি মেয়ে কনের সাজে সজ্জিত একটি মেয়েকে এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে, জামাইবাবু, পালান, বাড়িতে গিয়ে বিয়ে করে নেবেন। গাড়ি জিটি রোডে। সুজয়ের নতুন গাড়ি। সেই চালাচ্ছে। আমার পাশে পেছনের আসনে আমার বিয়ে না করা বউ! রাত আড়াইটের সময় সুজয়দের বাড়িতে পুরুত ডেকে আমাদের বিয়ে হল। শেষ রাতে আমার বউ বললে, আমি আপনার শালী। এতক্ষণে ওদিকে ওর বিয়ে হয়ে গেল ওই ভামটার সঙ্গে। আমি কিন্তু আপনাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিলুম—আই লাভ ইউ। সকাল নটা নাগাদ বউ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখি শ্বশুরবাড়ির লোকজন সব বসে আছে! সে কি তম্বি, মেয়ে ফেরত দাও। এ বিয়ে বিয়ে নয়, কিডন্যাপিং। সুজয় পুলিশের বড় অফিসার। নিজমূর্তি ধারণ করে বললে, বাড়ি ফিরবেন না লক-আপে যাবেন! সবাই ধড়মড় করে উঠে পড়ল। বিয়ে করতে গিয়েছিলুম সরলাকে, ফিরে এলুম রমলাকে নিয়ে।

—সরলার কী হল?

—হ্যাঁ, সরলার কী হল? সরলার বিয়ে হল না সে রাতে। মোটা বিয়ে করলে না। রেগেমেগে বেরিয়ে গেল। ধরাধরি করেও রাখা গেল না। কনের সাজে সরলা সারা রাত বসে রইল গয়নাগাটি পরে। ভারি করুণ ব্যাপার। রমলা বললে, যত ভাববে তত দুঃখ পাবে। ভুলে যাও। আপনি কিন্তু বিয়ের জায়গাটায় অনেকক্ষণ আটকে আছেন। সংসারে চিরপ্রচলিত নিয়মে বিয়ে হয়, সংসার নয়। জন্ম, মৃত্যু, শান্তি, অশান্তি। কেউ আগে যাবে, কেউ পরে যাবে। গড়বে, ভাঙবে। সময় চলতে থাকবে রাখালিয়া বাঁশি বাজিয়ে। ভেড়ার পালের মতো মানুষ চলতে চলতে একদিন দেখবে সামনে আর কিছুই নেই। ফেরার পথটাও হারিয়ে গেছে। উঃ! কি ভয়! কি আনন্দ! থাকার চেয়ে না-থাকাটা কত সুন্দর! কত বিরাট! আমার জীবনটা 'ট্র্যাজেডি'। কিছুই পাইনি। ছায়ার সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ!

—এই যুদ্ধটাই তো জীবন!

—ও-সব কথা শুনে শুনে কান পচে গেছে। আমি খুব একটা ভালো লোক নই। বড় কিছু ভাবার ক্ষমতা নেই। সারাটা জীবন অহংকারের গর্তেই পড়ে রইলুম। কাউকেই সুখী করতে পারলুম না। ভেতরে একটা লোক নয়, মেসবাড়ির মতো অনেক লোকের বাস। একটা আড্ডাখানা। বাড়ির বাইরের রকে যেমন নানা ধরনের লোক এসে বসে ঠিক সেই রকম। সেই জন্যে বেশ

কিছুকাল আমি মনে হয় পাগল হয়ে গিয়েছিলুম।

—কি রকম?

—কেবলই মনে হত, আমি যে আমাকে আমি বলছি, সে কি আমি!

—এ আবার কি?

—হ্যাঁ। সে এক সাংঘাতিক গোলমেলে ব্যাপার। যে-বাড়িতে রয়েছি, সেখানে কেন আছি? এ তো অন্য লোকের বাড়ি। রমলা কে? আমার এত কাছে ঘেঁষে আসছে কেন? ছি, ছি, ছি। লোকে কী বলবে? আপনি বলে সম্বোধন শুরু করলুম। রাতে আমার পাশে শুতে এলে কাঁদতুম, আমাকে আপনি খারাপ করে দেবেন না। আমি পুরুষ মানুষ, আপনি ভীষণ সুন্দরী। আমার কাম জাগছে। আমি কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে খারাপ কাজ করে ফেলতে পারি। রমলা ভাবত মজা করছি। গোটা শরীরটা উল্টে আমার ঘাড়ে এসে পড়ত। আমি চিৎকার করার চেষ্টা করতুম, বাঁচাও, বাঁচাও। উত্তেজিত রমলা বলত, কে তোমাকে বাঁচাবে? আমি বাঘিনী। একদিন উত্তেজনার মুহূর্তে আমাকে লাথি মেরে খাট থেকে ফেলে দিলে। থু থু করে সারা শরীরে থুথু দিলে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা ভেঙে চুরমার করে দিলে। রমলা চলে গেল। জানি না, কোথায় আছে। কার কাছে আছে।

—ডাক্তার দেখালে? সাইকোলজিস্ট?

—না, না, ডাক্তার দেখাব কেন? এ তো কোনো অসুখ নয়।

—তা হলে এটা কী?

—এটা একটা ব্যাপার। কী ব্যাপার কে বলবে! তবে আমি বেশ মজায় আছি। রমলা চলে গিয়ে আমাকে ভীষণ আনন্দ দিয়েছে। একটা মেয়েকে সারা জীবন বয়ে বেড়ানো ভীষণ ঝামেলার ব্যাপার। জীবনের পরিসরটা খুব ছোট হয়ে যায়। খোঁটায় বাঁধা গোরুর মতো।

—ওইসব জ্ঞান দিও না। লোকে তোমাকে শেয়াল বলবে। যে-শেয়ালটা অনেক লাফালাফির পর বলেছিল—Grapes are sour.

—জ্ঞান দেবার সামান্যতম ইচ্ছা আমার নেই। জ্ঞান দেওয়া যায় না। কেউ যদি বলে, কয়েক ফোঁটা শিশির ধরে দাও, তা কি সম্ভব? গাছের পাতা হয়ে খোলা আকাশের তলায় পড়ে থাক। ভোরের সূর্য যখন সেই বিন্দু বিন্দু শিশিরে ধরা পড়বে তখনই বোঝা যাবে কত শত হিরের টুকরো। কিছু খবর দেওয়া যেতে পারে, ইনফরমেশান। জ্ঞান ব্যক্তিগত। বাতাসের জ্ঞান পেতে

হলে একটা মনযুক্ত শরীর চাই।

—ঠিক আছে ভাই। তর্ক করতে চাই না। তুমি বলে যাও, আমি শুনে যাই। তোমার পরিবারে আর কোনো সদস্য নেই?

—না। এখন একেবারে একা। কিন্তু একা নই।

—মানে!

—একদিন গভীর রাতে বসে আছি।

—রমলা?

—রমলা চলে গেছে। সুন্দর রাত। ঘর অন্ধকার। হঠাৎ আমার ভেতর থেকে অতি সুন্দর এক পুরুষ বেরিয়ে এসে আমার সামনে বসল। বসেই বলল, তুমি আমার। আমার কোলে তুমি বসে আছ। তুমিই আমি। আমিই তুমি। ভীষণ ভয় এল মনে। এতকালের 'আমি'টা মিথ্যা হয়ে গেল। সেই অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষ বলল, 'আমি কখনো পুরুষ, কখনো প্রকৃতি।' নিমেষে সুন্দরী রমণী হয়ে গেল।

—কিছু খাও-টাও? নেশা, ভাং?

—একবার ছাত্রজীবনে বিজয়া দশমীর রাতে তাঁবার পয়সা ঘষা সিদ্ধি খেয়েছিলুম। তারপর বেধড়ক জুতোপেটা। তারপর আর ও পাড়া মাড়াইনি।

—এখন তোমার অবস্থাটা কী?

—আমার 'আমি'টা আর নেই। আমি মরে গেছি। এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। রাত যখন গভীর হয়। তিনি আসেন। কখনো পুরুষ কখনো নারী। সারা রাত কত কথা, কত গান। আনন্দ, আনন্দ। নারী হয়ে তিনি আমাকে আলিঙ্গন করেন। রমণ করেন। সে যে কি সুখ!

—রমণের কথা শুনতে চাই না। ওসব অতি অসভ্য ব্যাপার।

—রমণ বলতে আপনি কী বোঝেন?

—সবেতেই তোমার তর্ক।

—তর্ক নয়। আপনি কতকগুলো জিনিস সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। কোনো পুরুষই পুরোপুরি পুরুষ নয়। নারীও পুরোপুরি নারী নয়। হাফ, হাফ। যাকে বলা হয় অর্ধনারীশ্বর। আমাদের মাথার ডান আর বাম—দুটো ভাগে দু'দিকে দু'ধরনের কাজ হয়। ডান দিক আমাদের নকশা, বস্তুর গঠন, এইসব চেনায়। কোদাল, কুড়ুল, ছুরি, কাঁচি, গাড়ি, বাড়ি, ছবি, মূর্তি, কতরকমের পাতা, পাতার গঠন, ডালপালার আঁক-বাঁক, সংগীত, সুর, আবেগ। ডান দিকে আছে

সৃজনশক্তি। বাঁ দিকে আছে শৃঙ্খলা, কোনটার পর কোনটা। একের পর দুই, স্তর বিভাজনের ক্ষমতা, এটার পর ওইটা বলব, রাধার পরে কৃষ্ণ, দিনের পরে রাত, কুঁড়ির পরে ফুল, ফুলের পরে ফল। মানুষের বাঁ দিকের ব্রেনে আছে যুক্তি-তর্কের ক্ষমতা, আর আছে ভাষা। গানের সঙ্গে গণিত। তাল, লয়, ছন্দ, মাত্রা। ডান আর বাঁয়ের হাত ধরাধরি। ছন্দের সঙ্গে ভাষার মিলন। ব্রেনের দুটো দিককে যে সমান ভাবে ব্যবহার করতে জানে—সে-ই জানে প্রকৃত রমণ কী! বিবাহের প্রকৃত অর্থ কী! ফুলশয্যা কাকে বলে! কবিতায় বলা যেতে পারে,

অক্ষরের মালা গেঁথে
সাজিয়েছি চিঠি,
মহাশয়! বিনীত নিবেদন
হয়েছি শয্যাশায়ী
তিন দিন সি. এল-এর প্রার্থনা
ইওর্স ফেথফুলি!
সেদিন, তুমি যখন তোমাদের
বাগানে ফুল তুলেছিলে,
গাছের উঁচু ডালের দিকে
দু'হাত তুলে,
সবুজ শাড়ির আঁচল
সরে গেল একপাশে,
তোমার গৌরবর্ণ জ্বলছিল
তুষারের আলোর মতো,
আমি দেখেছি সে-রূপ
বিভোর হয়ে,
ময়ূর সিংহাসন অথবা কোহিনূর
পড়ে থাক একপাশে,
তুমি, তুমি, তুমি
হৃদয়ের শব্দে,
সকাল অকালে সরে গেল,
ছবি একবারই আঁকা হল

রয়ে গেল স্মৃতির দালানে,
এখন যেতে পার নদীর ওপারে॥

—হঠাৎ ব্যাড় ব্যাড় করে এক হাত একটা কবিতা বলার কারণ?

—মাথার দুটো ভাগের ফাংশান বোঝাবার জন্যে। প্রথম চারটে লাইন ছুটির দরখাস্ত। ওটা এল বাঁ দিকের ব্রেন থেকে। কার্য-কারণ-কায়দার ফ্রেমে আঁটা। সব দরখাস্তই ওইভাবে লেখা হয়। আর বাকিটা এল ডান দিক থেকে। যে-দিকে সৌন্দর্যের বোধ, আবেগ। যাদের বাঁ দিকটা শক্তিশালী তারা একরকম, যাদের ডান দিকটা শক্তিশালী তারা আবেগপ্রবণ, হাঁ করে ছবি দেখে, কান খাড়া করে গান শোনে, কবিতা আসে তাদের মনে, ধর্ম আসে, ভগবান আসেন। কৃষ্ণের বাঁশি, শ্রীমতীর নূপুরধ্বনি, জগতের বাইরের খবরাখবর।

—যে কোনো ব্যাপারকে কবিতা করা যায়?

—খুব যায়।

—ধর এই রকম বলছি, রাত হল। এরপর?

—কোনো সমস্যা নেই। লিখুন,

রাত হল, গভীর রাত,
যে-আলো জ্বলেছিল শহর
সাজাতে,
একে একে সব নিবে গেছে,
প্রহরীর মতো রাতপাহারায়
এখানে ওখানে·জ্বলছে হলুদ,
হলুদ আলো।
লোহার পাতের মতো
লম্বা হয়ে শুয়ে আছে রাজপথ।
ফুটপাথের বিছানার তামাশায়
পড়ে আছে ভবিষ্যৎহীন শিশু।
অন্ধকারের আবডালে নারী আর
পুরুষ
দ্রুত সেরে নিতে চায় নিয়ত
অভ্যাস।

বেপরোয়া হিসাবহীন,
সর্বনাশ আসবে আসুক।
রাত গভীর,
নিদারুণ শয্যায় শুয়ে কোনো
দৈত্য,
টাকার কর্কট ব্যাধি, দুঃস্বপ্ন,
মুখোশ পরা এক ডজন লোক,
বৃত্তাকারে ঘিরে আসে,
সি. বি. আই, সি. বি. আই।
ঘোরানো, প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি,
দ্রুত, দ্রুত, নেমে যাও,
যেখানে রাত আরও ঘন কালো,
যক্ষের দেশ, জালার পর জালা
কে যেন বলছে হেঁকে,
ভরে ফেল, ভরে ফেল
অতি নিরাপদ।
তারপর কোনো একদিন
সোনার চেন পরা কঙ্কাল
ঢাকনা খুলে হাড়ের হাত নেড়ে
নেড়ে বলবে,
চলছে চলুক।
গভীর রাত, ঘড়ি চলছে
হাড়ের কাঁটা ঘুরছে
মৃতের প্রহর॥

—এটা আমাদের কাগজে ছাপব। বেশি দিতে পারব না। পঞ্চাশ টাকা।

—কিচ্ছু দিতে হবে না। কবিতা সব সময় ফ্রি। আর ক'দিন পরে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা সব ফ্রি হয়ে যাবে। সাহিত্য আর সাহিত্যিক হবে অতীত ইতিহাস। ব্যস্ত মানুষ কেন পড়বে গুচ্ছের বানানো গল্প!

—তুমি লেখ কেন?

—কাঁদি বলে। আমার ভেতরটা খানখান হয়ে গেছে। তাই স্বপ্ন দেখি।

সুন্দর বাড়ি, সুখী পরিবার, প্রেম, গান, গল্প, ফুলফোটা বাগান, পাখির শিস, সুন্দরীর এল চুলের মতো ঝরনা, গল্প-বলা নদী। জীবন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা। নদীগর্ভ থেকে ছোট ছোট নুড়ি তুলে স্তূপ নির্মাণ। নিজেই থাকি নিজের মতন। এই দেখুন, এই কথার পেছনে কবিতার সাজঘর,

নিজেই থাকি নিজের মতন,
ঘর সাজাই।
নিজের ফুলে মালা গেঁথে
তাকে পরাই।
হয়তো কাছে হয়তো দূরে,
টেনে আনি নিজের কাছে
গান শোনাই।
নিজের কথা নিজেই শুনি,
গল্প-বলা রাত।
যুক্তি, তর্ক, থাক না তোলা
প্রেমের সঙ্গে প্রেম মেলাই।

—তুমি তো একসময় লিখতে। এক-আধটা পড়েছি। মন্দ নয়। গল্প একটু কম থাকে। শেষটা ঠিক টানতে পার না।

—শেষটা তো টানা যায় না, কাঁধে চড়ে যেতে হয়। কে আর হেঁটে হেঁটে শ্মশানে যায়!

—আরে আমি মানুষের শেষের কথা বলছি না, বলছি গল্পের শেষের কথা।

—গল্প শেষ হলে তো জগৎটাই শেষ হয়ে যাবে। হাজার হাজার বছর ধরে কত গল্পই বলে চলেছে। আচ্ছা আসুন একটা ওয়ার্কশপ করা যাক। আমি শুরু করছি। শ্যামবাজার ফাইভ পয়েন্টে বাস থেকে নেমে প্রশান্তর মনে পড়ল, এখানে গোলবাড়ি নামে একটা রেস্তোরাঁ আছে। সেলসের কাজে সারাদিন অনেক ঘুরেছে। ভেতরটা খাব খাব করছে। ঘড়ি দেখল। পাঁচটা পাঁচ। মিত্তির সাড়ে ছটার আগে দেখা করবে না। গোলবাড়ি ডাকছে। আগে দু'বার এসেছে। অনেক আগে।

প্রশান্ত ঢুকল। খুব বেশি ভিড় নেই। রাস্তার দিকে মুখ করে বসল। ব্যাগটা রাখল পায়ের কাছে। চারপাশে তাকাল। জায়গাটা খুব একটা বদলায়নি।

রান্নাঘর থেকে সুন্দর একটা গন্ধ আসছে। ওপাশের আসনে রাস্তার দিকে পেছন করে মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক খুব মন দিয়ে কিছু একটা গোগ্রাসে খাচ্ছেন। মাথায় ক্রিকেট ক্যাপ। মুখের ওপর দিকটা দেখা যাচ্ছে না। নাকের ডগা আর চিবুকটা দেখা যাচ্ছে।

এইবার লোকটিকে আপনি তৈরি করুন। গঠন করুন। লোকটির গায়ের রং একসময় বেশ ফর্সা ছিল। এখন রোদে পুড়ে তামাটে। হ্যাঁ, এই সময় মধ্যবয়সি এক মহিলা এলেন। ভদ্রলোকের পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু খাবে? প্রশান্ত শুনতে পেল। ভদ্রমহিলা উঠে ক্যাশে গিয়ে দাম মিটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক তখনো পরিপাটি করে হাড় চুষছেন। প্রশান্ত এইসব দেখছে। এখন কথা হল গল্পটা কাকে ঘিরে ঘুরবে? প্রশান্ত, ওই লোকটি, ওই মহিলাটি? মহিলাটির সঙ্গে লোকটির কী সম্পর্ক!

—ভাই! এ খুব কঠিন ব্যাপার! মহিলাটির সঙ্গে লোকটির কোনো অবৈধ সম্পর্ক!

—আমি জানি না। গল্প তৈরি করবেন আপনি।

—গল্পটা তোমার। আমার গল্প হলে অন্যভাবে শুরু হত।

—শুনি, কী রকম?

—নৌকো এসে লাগল ঘাটে। সর্বাণী নৌকো থেকে নেমে জেটিতে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালেন। অনেক বদলে গেছে। পুরনো বাড়ি নেই বললেই চলে। বড় বড় ফ্ল্যাট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সব মুখই অচেনা। তিরিশ বছরে জায়গাটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। সর্বাণীর পেছনে যে স্বাস্থ্যবান যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে তার নাম শঙ্কর। শঙ্কর বললে, দিদি দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? চল, চল। দেরি হয়ে যাবে।

এইখানেই আটকে গেছি। এরা কারা? কোথায় যাচ্ছে? কীসের তাড়া!

—আমি বলছি। পারঘাটের বাইরে অনেক রিকশা দাঁড়িয়েছিল। তারই একটায় উঠে বসল। সকাল দশটা। শীত যাই যাই করছে। মেটে মেটে রোদ। সকালে ঘন কুয়াশা হয়েছিল। চালক জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাবেন? শঙ্কর বললে, দক্ষিণ পাড়ায়। বরফকলের পাশে। একটু জোরে চালাও।

এরপর আর জানি না।

—আমি একটু ঠেলে দি?

—দিন।

—গলিটা ঢোকার মুখে তেমন প্রশস্ত নয়। ভেতর দিকে যথেষ্ট চওড়া। একটা স্কুল, ফাঁকা মাঠ। চারপাশের বাড়িগুলো ছোট ছোট। ছিমছাম। নতুন একটা শিবমন্দির ঝকঝক করছে। ওরা দূর থেকেই দেখতে পেল, খাট এসে গেছে। ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে। অনেক লোকজন। এদের দুজনকে দেখে প্রবীণ একজন বললেন, সেই এলি, দেরি করে ফেললি। দেখা হল না।

এইবার কি হবে?

—কে মারা গেলেন! এই দুজনের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক! এই সমস্যা তো?

—ঠিক তাই!

—তাহলে শুনুন, সর্বাণী বাড়ির অমতে ভোলানাথকে বিয়ে করায় বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। ভোলানাথ ভালো ছেলে। সৎ, পরিশ্রমী, বিনয়ী এবং সুন্দর। সর্বাণী ব্রাহ্মণকন্যা, ভোলানাথ কায়স্থ। বিয়ের পর স্ত্রীভাগ্যে ভোলানাথ বড়লোক হল। কোন্নগরে বিশাল বাড়ি। শঙ্কর কিন্তু দিদিকে ভোলেনি, ছাড়েনি। দিদিই তাকে মানুষ করেছে। শঙ্কর এখন জামাইবাবুর ব্যবসার ডান হাত। মারা গেছেন শঙ্কর-সর্বাণীর বাবা, গোঁড়া ব্রাহ্মণ ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পূজা, পার্বণ, শাস্ত্র, ভগবান এইসব নিয়ে থাকতেন। একটু পরেই তিনি চলে যাবেন শ্মশানে। সেখানে আগুন জ্বলে উঠবে। দেহের খাঁচা খুলে আত্মা-পাখি সাঁ-সাঁ করে উড়ে যাবে শিবলোকে।

বৃদ্ধা মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কতদিন তোকে দেখিনি। কত সুন্দর হয়েছিস। শাসন আর জাতের অহংকারে নিজেকে গুটিয়ে ছোট করতে করতে ওই দেখ একটা পুঁটলি। শেষ তিন দিন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। কেবল বলতে লাগলেন—সর্বাণী পালিয়ে আয়, কাক ঠোকরাবে। তারপরে সব কথা চলে গেল। কেবল বলতে লাগল—বাণী, বাণী। ঠোঁটের কোণে হাসি। ডান হাতে মুঠো। চলে গেল। যেন তোর হাত ধরেই গেল। এই কথা শোনামাত্রই সর্বাণীর শরীর শিথিল হতে থাকল; যেন একটা পোশাক হ্যাঙার থেকে খুলে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কী হল, কী হল! সবাই ছুটে এলেন। সর্বাণী মেঝেতে শুয়ে আছে। বিস্ফারিত দুটি চোখ। অভিজ্ঞ একজন নাড়ি টিপে বললেন—নেই।

অনেকটা এগিয়ে দিলুম। এইবার আমারটাকে আপনি কায়দা করুন। রেস্তোরাঁ। ক্রিকেট ক্যাপ মাথায় মধ্যবয়সি এক মানুষ। মাথা নিচু করে

খাচ্ছেন। একজন মহিলা এলেন, বিল মিটিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। প্রশান্ত রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

—প্রশান্ত ভদ্রমহিলাকে দেখছে। দোকানের বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছেন। ভীষণ আকর্ষণীয় চেহারা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর রাস্তা পার হয়ে উল্টো দিকের একটা নার্সিংহোমে ঢুকে গেলেন। প্রশান্ত তখনো কোনো অর্ডার দেয়নি। ব্যাগটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। রাস্তা পার হয়ে ঢুকে গেল নার্সিংহোমে। সামনে অনেকটা জায়গা। কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা। ভদ্রমহিলাকে খুব চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু গেলেন কোথায়! বাঁ দিকে দরজা। রিসেপশান। ডান দিক দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। প্রশান্তর হঠাৎ মনে হল নাম—আরতি। স্কটিশে একসঙ্গে পড়েছে। আরও সুন্দরী হয়েছে। প্রশান্ত দোতলায় উঠে গেল। লম্বা বারান্দা। দূরে আরতি দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলছে এক ডাক্তারবাবুর সঙ্গে।

এই নার্সিংহোমে প্রশান্তকে মাঝে-মধ্যেই আসতে হয়। সকলেই তার চেনা। তার কোম্পানি আন্তর্জাতিক। ভালো ভালো ওষুধ তৈরি করে। ডাক্তারবাবু ভেতরে চলে গেলেন। আরতি ফিরে আসছে। প্রশান্ত সামনে গিয়ে বললে, আরতি চিনতে পারছ? মহিলা ভুরু কুঁচকে রুক্ষ গলায় বললে, কে আপনি? ভুল করছেন, আমার নাম আরতি নয়। পথ ছাড়ুন। প্রশান্ত হতচকিত।

—নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনলেন।

—কেন?

—এবার কি হবে? ব্যাপারটা তো ফেঁসে গেল!

—তা গেল ; কিন্তু বেরোতে হবে! চ্যালেঞ্জ। গল্পের চরিত্ররা এই রকম করে। দেয়াল তুলে দেয়। এগোনো বন্ধ করে দিতে পারে। তখন নদী যেভাবে বাঁক নেয়, সেই ভাবে বেঁকে যেতে হয়। প্রশান্ত, মহিলা যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন সেই দিকে এগিয়ে গেল। ঘরের বাইরে নাম-ফলক, ডক্টর বি. ঘোষ। ঘরে কেউ নেই। ডান পাশে একটা দরজা। দরজার ও-ধারে একটা ওয়ার্ড। কয়েকটা বেড। প্রশান্ত দেখতে পেল ডাক্তার ঘোষ একটা বেডের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। এক বৃদ্ধা শুয়ে আছেন। আচ্ছন্ন অবস্থা। প্রশান্ত অপেক্ষা করে রইল। ডক্টর ঘোষ ফিরে এলেন। প্রশান্তকে চিনতে পেরে বললেন, কী ব্যাপার! অনেকদিন পরে! প্রশান্ত

সরাসরি প্রশ্ন করল, একটু আগে যে-ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর নাম কি আরতি? ঘোষ যেন একটু অবাক হলেন, জিজ্ঞেস করলেন, কেন বলুন তো! আরতি আমার স্ত্রী। সেকেন্ড ওয়াইফ। প্রশান্ত বললে, আমরা একই কলেজে একসঙ্গে চার বছর পড়েছি। আজ কিন্তু আমাকে চিনতে পারলেন না! ডাক্তার ঘোষের সংক্ষিপ্ত উত্তর, ইজ ইট!

—বাঃ, বাঃ বেশ ভালো জায়গায় এসেছেন। আমি যেন এইবার অনেকটা দেখতে পাচ্ছি। বেশ বড়সড় একটা গল্পের ছায়া।

আচ্ছা, আরতিকে সরলা করলে কেমন হয়। আর ওই অচৈতন্য বৃদ্ধাকে রমলা। আর ওই গোলবাড়িতে যে-লোকটা টুপি টেনে বসে আছে সে আমি!

—সে কী করে হয়?

—জীবনটাকে আপনি কি এতটুকু একটা পানের খিলি ভাবেন? চুন, খয়ের, কয়েক কুঁচি সুপুরি। ভগবান আরাম করে চিবোচ্ছেন আর মাঝে মাঝে পিক ফেলছেন। আত্মজীবনীর শেষ প্যারাটা লিখুন—গল্পের সঙ্গে জীবন মেলান,

ঝোলা কাঁধে ওই যায়
সেই ফেরিওলা,
পল্লীর পথে পথে,
হেঁকে বলে যায়,
জীবন চাই, মানুষ চাই?
মশা চাই, আরক চাই?
কিছু দাও, কিছু নাও
হাসি আর কান্না।

লিখবেন না দেখবেন?

—মানে?

—মানে স্ক্রিপ্টটা পড়বেন অথবা মঞ্চে অভিনয় দেখবেন? ওই দেখুন শুয়ে আছে রমলা! স্যালাইনের বোতল। টিপ, টিপ, সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা। আর বসে আছে পাশে কে? রমলা! রমলা সরলা হয়ে রমলাকে ধরে রাখতে চাইছে।

—ঘটনাটা কী? রমলা তো চলে গেল!

—রমলা চলে গেল। চাকরিটা ছেড়ে দিলুম। সারা ভারতে একবার চক্কর

মেরে এলুম। সংসারে বিষয়ের যে-সব আবর্জনা সঞ্চয় করেছিলুম, সব বিলিয়ে দিলুম ডেকে ডেকে। পরিচিতরা বলতে লাগল, হাফ-ম্যাড এইবার ফুল-ম্যাড হয়েছে। ফাঁকা ঘরে নিজের কণ্ঠ কি ঝংকার! দেয়াল খালি। স্মৃতি ছবি হয়ে ঝুলছে না। বিস্মৃতির নেতা দিয়ে স্মৃতি মুছে দেওয়া। আঃ-আরাম। আঃ-শান্তি। আঃ-মুক্তি।

হঠাৎ একজন এল। একবার যেতে হবে। আপনার স্ত্রী।

আমার স্ত্রী!

হ্যাঁ, সেই রকমই বলেছেন। জ্ঞান হারাবার আগে একটাই কথা—ওকে একবার খবর দাও। আমার নাম, আমার ঠিকানা।

সুন্দর একটা শরীর বেড়ে শুয়ে আছে। বড় বড় চোখ দুটো খোলা। নীল সাগর। দু'জনে তাকিয়ে আছি দু'জনের দিকে। জল নামছে। জীবন আর মৃত্যুর দৃষ্টি বিনিময়। দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে কি মৃত্যুর আকর্ষণ থেকে টেনে রাখা যায়!

কে এল ঘরে? সরলা?

হ্যাঁ, এটা আমাদের দু'জনের নার্সিংহোম।

হল না। মাথায় মাথাটা ফিরে এল না। আমরা শুধু ঝুঁকে থাকি। গভীর কোনো কূপ। অনেক নীচে চিক্ চিক্ কালো জল। একটু আলো।

সরলা বললে, ভেব না, আমি তোমার পাশে আছি। স্ত্রী হয়ে নয় মা হয়ে। আমার চোখে তুমি এখন 'অন্য মানুষ'।

দুলারি
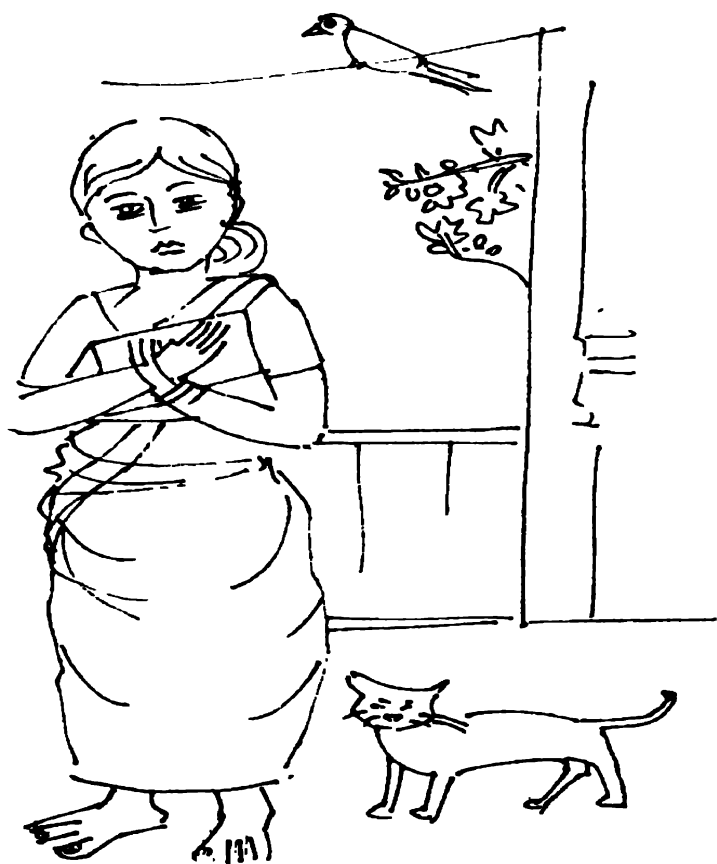
এই দুনিয়ায় ঘ্যান ঘ্যান করে অনেকদিন ঘুরছি। ছাই-পাঁশ কিছুই বুঝতে পারছি না। বেঁচে আছি এই পর্যন্ত। আচ্ছা দুনিয়া কাকে বলে, আর পৃথিবীই বা কাকে বলে? পৃথিবী একটা গোল মতো ব্যাপার, সূর্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে অনন্তে ঘুরপাক খাচ্ছে অনন্তকাল ধরে! সূর্যই তাকে অদৃশ্য লেত্তিতে বেঁধে লাট্টুর মতো ঘোরাচ্ছে। ঘুরতেই থাকবে, ঘুরতেই থাকবে। সে ঘুরুক, যে যেমন বরাত করে জন্মেছে। আধখানা রাত। আধখানা রাত মানে, চব্বিশ ঘন্টার বারোটা ঘন্টা অন্ধকারে ফেলে দিয়ে আমাদের হাতে হ্যারিকেন করে ছেড়েছে। বিদ্যুতের বিল মেটাতে মেটাতে প্রায় দেউলে। ইংরেজ আমলে সংসার শুরু করেছিলুম ন'টাকা বিল দিয়ে। এখন দিচ্ছি হাজার পাঁচেক।

এই গোল বস্তুটির আবার দু'রকম ঘোরা। যেন সুন্দরী 'ব্যালে ড্যানসার'—এক ঠ্যাঙে গোল হয়ে ঘুরছে। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। গ্রীষ্ম হচ্ছে, বর্ষা হচ্ছে, শীত হচ্ছে। যা হচ্ছে হচ্ছে। এ একটা গোল মাটির তাল নয়—সর্ব অঙ্গে অনেক কেরামতি। নদী, পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি, অরণ্য, বরফ, সুগম, দুর্গম। ভাবলে মাথা ঘুরে যাবে বলে ভাবি না। এই বাঘ বেরোচ্ছে, এই সাপ। ক্যাঁট করে কাঁকড়া বিছে কামড়ে দিলে। প্রাণ যায়। পটল তোলে তোলে। কৌতূহল মানুষকে কত কী শেখায়। হঠাৎ মনে হল, পটল তোলা মানে কী? মরে যাওয়াকে পটল তোলা বলে কেন? তখনই শিখলুম দুটো ভিন্ন শব্দ—পটল আর পটোল। আমরা পটল খাই না, পটোল খাই। পটল তোলা যেতে পারে, খেতে পারা যায় না।

বাঁচছি আর, শিখছি আর বাঁচছি। কতজনে কত কী শিখিয়ে গেল। জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাটি হল একটি মেয়ের কাছে। সুন্দরী স্মার্ট। কিঞ্চিৎ দুষ্ট প্রকৃতির। কখনো গম্ভীর, শান্ত, সমাহিত। কখনো চপলা, কখনো তরলা। দুঃসাহসী প্রকৃতির। যে-সময়টায় আমি কলেজে ব্যা, ব্যা করে পড়ছি, সেইকালের সমাজ ছিল ভীষণ রক্ষণশীল। উঠতি বয়েসের মেয়েদের সিন্দুকে রাখতে পারলেই যেন বাপ-মায়েদের শান্তি। সেই স্ট্যান্ডার্ডে এই মেয়েটিকে বলা

যেতে পারে গেছো মেয়ে। নারী স্বাধীনতার আদি উদাহরণ। সকলেই খুব ভালোবাসত। শিক্ষিত প্রবীণরা বলতেন ইংরিজিতে—ভেরি আপরাইট। ভেরি সিম্পল। ডাক্তারবাবু, আমার জ্যাঠামশাই বিভোর হয়ে বলতেন, দেবী দুর্গা। মনে কোনো আবর্জনা নেই। ক্লিয়ার ব্লু স্কাই। স্পার্কলিং ডায়মন্ড। প্রবীণরা বলতেন, কেউ তোকে বিয়ে করবে না।

সঙ্গে সঙ্গে স্মার্ট উত্তর—আমাকে বিয়ে করবে কেন? আমিই তো বিয়ে করব। যখন করব তখন করব। আমাকে বিয়ে করা অত সহজ নয় দিদা। বলেই এক লাইন গান,

সে যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা।
সে যে নাগাল পেলে পালায় ঠেলে, লাগায় চোখে ধাঁধা॥

এ-সব রঙ্গ রসিকতা আমার ঠাকুমার সঙ্গে হত। এলাহাবাদের মেয়ে। পাকা পেয়ারার মতো গায়ের রং। সুন্দর একটা মুখ। বড় বড় বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ। ছোট্ট টিকালো নাক। সেকালের সৌন্দর্য-রসিকরা একটা শব্দ ব্যবহার করতেন—'প্যারাগন অফ বিউটি'। ঠাকুমার বাবা এলাহাবাদের সিভিল সার্জেন ছিলেন। প্রতাপশালী ব্যক্তি। সাহেবি ধরন। বিখ্যাত মতিলাল নেহেরুর প্রাসাদের পাশে ছিল এক একর জমির ওপর তাঁর সুবিশাল বাংলো। তাহলে এই দাঁড়াল, আমার ঠাকুমা যথেষ্ট শিক্ষিত, বড়লোকের মেয়ে। আমার ঠাকুরদাও কিছু কম যেতেন না। সায়েন্টিফিক। বার কয়েক বিলেত গিয়েছিলেন। পরীক্ষাগারেই তাঁর দিন কাটত। জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গের স্বভাব যতটা ভালো জানতেন, মানুষ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতেন না। কতরকমের মানুষ আছে। তাদের স্বভাব, চরিত্র। কেউ বাঁশ হাতে ঘুরছে, কেউ কঞ্চি। মুখে মিষ্টি হাসি ভেতরে বিষের পুরিয়া।

মাঝে মধ্যে আমাদের সাবেক বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়াতেন এক বাউল। হাতে একতারা। এসেই ধেই ধেই করে নাচতেন আর গাইতেন,

জগতে লোক চেনা ভার মুখ দেখে।
মুখে সবাই পরম বন্ধু হৃদয় ভরা বিষ॥

আমার ঠাকুমা এই বাউলটির গান ভীষণ ভালোবাসতেন। এমনও শুনছি, এই বাউল, আমাদেরই কোনো আত্মীয়। অবৈধ প্রেমঘটিত কোনো কারণে অথবা সাপের কামড়ে দেশ-ছাড়া হয়েছিলেন। ব্যাপারটা বুঝিনি। ঠাকুমা

বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

কোনো এক সময় বীরভূমে গিয়েছিলেন আত্মীয়ার বিয়েতে। মাঠের মাছে প্যান্ডেল। শেষ রাতে সাপের কামড়। ভোর বেলায় 'ডিক্লেয়ার্ড ডেড'। শরীর নীল। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ। হঠাৎ এক ভৈরবীর আবির্ভাব। তুক-তাক, শেকড়-বাকড় দিয়ে বিষ নামালেন। বললেন, পুনর্জন্ম হল। এই নতুন জন্মে 'শিব' এখন আমার। তোমাদের কাছে, সংসারে থাকলে এর শরীরে বিষ আবার নামবে। বোরা সাপের বিষ ভয়ংকর। শরীরের মাংস খসে খসে পড়বে। তখন সমবেত সিদ্ধান্ত হল, নিয়ে যাও। ভৈরবীর পেছন পেছন সে অদৃশ্য হল। মাঠের পথে, আলের পথে। মা-মরা ছেলে, তাই কোনো সমস্যা হল না। সবাই বলতে লাগলেন, বেঁচে থাকা নিয়ে কথা। মরে গেল তো হয়েই গেল। এ-সব ভেতরের কথা ঠাকুমার মুখে শোনা। ছেলেটির বাবা বছর না ঘুরতেই একা 'কটা সুন্দরী'কে বিয়ে করলেন। 'কটা' মানে, তামাটে রং। চোখের মণি দুটো বেড়ালের মতো। লম্বা, রোগা। পা-দুটো বেজায় লম্বা। হাত দুটো গাছের ডালের মতো। একবার না-কি এ-বাড়িতে এসেছিলেন। কথায়, কথায় একটাই কথা, এ-সব আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

অনেক, অনেক বছর পরে উঠানে এক বাউল এসে দাঁড়ালেন! হেমকান্তি। গৌরাঙ্গদেবের মতো লম্বা লম্বা চুল। অপূর্ব কণ্ঠস্বর। ঠাকুমাকে বললেন, চিনতে পার? আমি হৈম। ভগবানের দংশনে আমি এমন হয়ে গেছি। বলেই গান ধরেছিলেন, আমার জাত গিয়েছে, যবে আমায় কৃপাময়ী কৃপা করেছে।

ঠাকুমাকে আমি সোনা মা বলতুম। তিনি এইসব অতীতের গল্প বলতেন। আমার ইংরিজি শিক্ষা তাঁর কাছে। তাঁর কিছু বিশেষ ক্ষমতা ছিল। মুখ দেখে মানুষের মন পড়ে ফেলতেন। আমি কী ভাবছি, পট পট করে বলে দিতে পারতেন। তার ফলে এই হল, খারাপ কিছু ভাবার সাহস হত না। খারাপ কোনো চিন্তা এলেই মনে মনে অনবরত—মা, মা করতুম।

আমি যে মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়তুম, তাঁর বাড়ির পেছন দিকে ছিল ছোট্ট একটি পতিতাপল্লী। পড়তে পড়তে জানালা দিয়ে তাকালে নানা রকম দৃশ্য দেখা যেত। ভালো কিছু নয়। পড়ুয়াদের মধ্যে গোটাকতক অকালপক্ব ছিল। মাস্টার মশাই যখন ঘরে থাকতেন না, ওরা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াত। আর সেইসব মেয়েদের খোলা শরীর দেখে ছটফট করত।

নানারকম বিশ্রী বিশ্রী কথা বলত।

মাস্টার মশাই হোমিয়োপ্যাথি করতেন। বাইরের ঘরে ডিসপেনসারি। একপাশে পর্দা, সেখানে তাঁর স্ত্রীকে বসাতেন। আমাকে করেছিলেন কম্পাউন্ডার। এই পল্লীর মেয়েরা এসে পর্দার আড়ালে গিয়ে মাস্টার মশাইয়ে স্ত্রীকে সব বলত, এই হয়েছে, তাই হয়েছে। মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী একটা খাতায় রুগির নামের তলায় সব লিখে এনে মাস্টার মশাইয়ের টেবিলে দিতেন। খাতার মলাটে বড় বড় করে লেখা ছিল —Case Diary। এরপর আমাকে ওষুধ বলতেন। উল্টোদিকে বসে আমি পুরিয়া করতুম। ভীষণ ভালো লাগত। মনে হত, মানুষের জন্যে কিছু একটা করছি।

এই মেয়েদের কাছ থেকে দেখতে, দেখতে, এদের জীবনের দুঃখের কথা শুনতে শুনতে পুরুষদের ওপর আমার অদ্ভুত একটা রাগ তৈরি হয়েছিল। সেই রাগ আমার নিজের ওপরেও এসে গিয়েছিল, কারণ, আমিও তো পুরুষ। মেয়েরা কি কেবল ভোগের খাদ্য। ওই যে দুটো ছেলে বিজয় আর বিহারী, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যত অসভ্য, অসভ্য কথা বলে, ওরা কি মানুষের বাচ্চা, না জন্তু। ওরা এ-সব শিখল কোথা থেকে, কে শেখাল। নিশ্চয় কোনো নোংরা মানুষ! এরা নিজেদের মা, বোনের দিকে কোন দৃষ্টিতে তাকায়!

ওই পল্লী থেকে সাবিত্রী বলে কমবয়সি একটি মেয়ে মাঝে মাঝেই আসত। মুখটা যেন ভোরে ফোটা স্থলপদ্মের মতো পবিত্র। মা সরস্বতীর মতো গায়ের রং। জোড়া দিঘির মতো দুটো চোখ। সেদিন যেদিন এসেছে, তার জন্যে ওষুধের পুরিয়া তৈরি করছি, টপ্ করে এক ফোঁটা জল মিল্ক সুগারের ওপর পড়ে গেল। মাস্টার মশাই লক্ষ্য করেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী হল?

উত্তর দিতে পারলুম না। মুখ নিচু করে রইলুম। চোখ ভর্তি জল। গত রাতে সাবিত্রীর ওপর সারারাত কী অত্যাচার হয়েছে আমি শুনে ফেলেছি। সাহস করে মাস্টার মশাইকে বলেই ফেললুম, আপনি ওদের জন্যে এত করেন, আপনি সাবিত্রীকে ওই নরক থেকে উদ্ধার করতে পারেন না?

মাস্টার মশাই হেরে যাওয়া মানুষের করুণ গলায় বললেন, পারি না। একটা ছেলেকে আশ্রয় দেওয়া যায়, একটা মেয়েকে যায় না। আমার স্কুলের চাকরিটা চলে যাবে। আমার কাছে কোনো ছেলে পড়তে আসবে না। পাড়ার

লোক, আত্মীয়-স্বজন আমার সম্পর্ক ত্যাগ করবে। এমন কী আমি খুন হয়ে যেতে পারি। সাবিত্রী হল অভিশপ্ত হিরা। শরৎচন্দ্র কি পেরেছিলেন রাজলক্ষ্মীকে উদ্ধার করতে। মানুষ কুকুরেরও অধম। সাবিত্রী যেখানে যাবে পেছন, পেছন গুণ্ডারাও যাবে। এ কীরকম জান, একটা মানুষ গভীর একটা কূপে পড়ে গেছে। মৃত্যু ছাড়া মুক্তির উপায় নেই।

কেন জানি না সাবিত্রী আমার দিকে অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। ওই পাকা ছেলে দুটোর প্রভাবেই হয়ত—আমি ভাবতুম প্রেম। সাবিত্রী আমার প্রেমে পড়েছে। আর এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব ব্যাপার এসে পড়ত! বেশ গর্ব অনুভব করতুম। মেয়ে মানে মহাদেশ। আমি একটা মহাদেশ জয় করে ফেলেছি। কিছুক্ষণ এই পুলকে পুলকিত থাকার পর একটা অনুশোচনা আসত—ছি, ছি, আমি খারাপ হয়ে যাচ্ছি। আমার ভালো লাগছে। বলতে পারছি না কাউকে। বন্ধুদের বলা থাকে না। এ যে খুব গোপনীয় ব্যাপার!

আর থাকতে না পেরে আমার পরম বন্ধু সোনা মাকে বললুম, আমি নষ্ট হয়ে গেছি। আমার ভেতর একটা মেয়ে ঢুকে গেছে। একটা খারাপ মেয়ে।

মেয়ে কখনো খারাপ হয় না। নারী হল ধরিত্রী। মায়ের জাত।

পুরো ঘটনাটা সোনা-মাকে শোনালুম। শুনে বললেন, মেয়ে নয়, তোর মধ্যে ঢুকেছে মেয়েদের দুঃখ। এই পৃথিবী মেয়েদের কোনো দিন সুখে থাকতে দেবে না। পুরুষরাই এর জন্যে দায়ী।

—সাবিত্রীকে উদ্ধার করা যায় না?

—কী ভাবে? বিয়ে করবি? শেষ পর্যন্ত সংসার করতে পারবি না। মেয়ে হল ঘর। এ মেয়ে ঘর নয়, সরাইখানা। কত লোক আসে যায়। সবাই এক রাতের অতিথি।

—বিয়ের কথা বলিনি। বিয়ে আমি কোনো দিন করব না।

—তাহলে?

—ভাব না। তুমি ভাবলেই একটা উপায় বেরোবে।

সোনা মা থমথমে মুখে থম মেরে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। মুখে একটা আলো ফুটল। হঠাৎ বললেন, ‘হৈম’। সেই বাউল। তাঁরই নাম হৈম। সোনা মা বলতে লাগলেন, ‘মেয়েটা যদি সত্যিই পাপ-ডাঙা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তাহলে ওকে কায়দা করে হৈমুর আশ্রমে পাঠিয়ে দে।’

'তাঁকে তো জানাতে হবে।'

'সে তুই একদিন রানাঘাটে তার আশ্রমে চলে যা।'

সাবিত্রী, সাবিত্রী, শয়নে-স্বপনে সাবিত্রী। বাপরে মেয়েদের কি বশীকরণের ক্ষমতা। কাছে নেই, মনে হচ্ছে কত কাছে! রোজ স্বপ্নে আসছে। কত রকমের স্বপ্ন। হরেক রকমের অন্তরঙ্গ কাণ্ড কারখানা। লেখাপড়ার বারোটা বুঝি বাজল। মেয়েটাকে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে তুলে আনলেই সব সমস্যার সমাধান! তা হবার নয়। পরে, মানে এখন, যখন আমার অবস্থা বৃহৎ, বৃদ্ধ এক শকুনের মতো—আমি সাহস করে লিখতে পারি—মানুষের নিজের 'ইচ্ছে' বলে কিছু থাকতে পারে না। পরিবার, সমাজ, বংশমর্যাদা, হ্যানাত্যানা—জীবন সব শেকলে বাঁধা। বেঁচে থাকলে নাম কী হবে—ভগবানই জানেন—বদনামের ভয়েই আড়ষ্ট।

একদিন সন্ধের মুখে পাড়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে চড়কের মেলায় সাবিত্রীকে একা পেয়ে গেলুম। মেলায় আমার যাওয়ার কারণ—মা বলেছিলেন, একটা পিঁড়ে কিনে আনিস তো। সাবিত্রী একটা স্টলে চুল বাঁধার জিনিসপত্র কিনছিল। এমন রূপসী—যে একবার দেখেছে সে মজেছে। এমন মেয়েকে ঘরে রাখার অনেক বিপদ। যে কোনো মানুষের পক্ষেই এইরকম একটা মেয়ে, হিরে, জহরতের মতোই ঐশ্বর্য। ডাকাত পড়বেই। সোনা মা বলেছিলেন, খুব সুন্দরী মেয়েদের জীবনে সুখ, শান্তি পাওয়ার অনেক রকমের বাধা স্বাভাবিক কারণেই এসে হাজির হয়। কিছু করার নেই।

খুব ভয় করছিল আমার। কাছে গিয়ে ডাকব কি? বুক কাঁপছে। পেছনে দাঁড়িয়ে আস্তে ডাকলুম, 'সাবিত্রী'! চমকে ফিরে তাকাল। এক ঝলক হাসি মুখে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। আতঙ্কের ছায়া। চাপা স্বরে বললে, 'সকলের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলো না। তোমার বদনাম হয়ে যাবে।'

একটু সাহস বাড়ল। বললুম, 'তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।'

'তাহলে ওই অন্ধকার দিকটায় চল।'

ওদিকে একটা বন্ধ চটকল। ভূতুড়ে একটা বস্তি। মুসলমান পাড়া। আরও ওদিকে ভাঙ্গিপাড়া। মুরগি, শূকর। খানাখন্দ, নোংরা। একটা বিশাল তেঁতুলগাছের ঘুপচি অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সাবিত্রী বললে, 'জায়গাটা খুব বাজে। তাড়াতাড়ি বল।'

'তুমি নতুন জীবন চাও?'

'চাই। কিন্তু কেউ দেবে না।'

'পালাতে পারবে?'

'কার সঙ্গে? তোমার সঙ্গে?'

'না।'

'তোমার সঙ্গে আমি পালাতে পারি; কিন্তু তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমি যে তোমাকে ভালোবাসি।'

'কাল কোনোওভাবে আমাদের বাড়িতে আসতে পারবে। সোনা মার কাছে!'

'আসব।'

অন্ধকারে আমরা দু'জনে দু' দিকে ভেসে চলে গেলুম।

জীবনের প্রায় শেষ রাতে এসে ভোরবেলার কথা বলার কোনো মানে হয় না। যৌবনের 'আমি'-টাকে মানুষ চিনতে পারে না। যৌবন একটা ঘোর, একটা নেশা। মনের নেশার সঙ্গে তফাতটা এই, মদের নেশায় কী করেছি জানার উপায় থাকে না। যৌবনের নেশায় কী করেছি বৃদ্ধ বয়সে ছবির মতো সব মনে পড়তে থাকে। বিচার শুরু হয়। কিছু কিছু বোকামির জন্যে নিজের ওপর রাগ হয় ভারি। হাসি পায়। নিজের প্রতি ঘৃণা আসে।

সাবিত্রী এল না। কোনো দিনই এল না। চোখের সামনে হয়ে উঠল দামি, ডাকসাইটে বেশ্যা। সে যখন এল না, আমার ভীষণ অভিমান এল। ভীষণ ঘৃণা এল। তাকে একটু একটু করে একেবারেই ভুলে গেলুম। পড়াশোনায় মন ফিরে এল। ওই মাস্টার মশাইয়ের কাছে যাওয়া বন্ধ হল। আমি ঘুরে গেলুম। আমি বেঁচে গেলুম।

জীবনের এতটা পথ হেঁটে এসে এখন একলা বসে ভাবি, সাবিত্রী কি সত্যিই আমার মন ছেড়ে চলে গেছে! যায়নি। আমি তাকে আজও ধরে রেখেছি। সময়টা যদি ফিরে আসত, আমি সেই বিশাল গাছের তলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে তার হাত দুটো ধরে বলতুম, তুমি আমার দেবী, তুমি আমার প্রথম প্রেম। তুমি কষ্ট পাও, তাই আমি দুঃখ পাই। চোখের জলে জীবন পালটাবে না, তাই তোমার সব জল শুকিয়ে গেছে। যারা তোমার দেহটাকে ছিঁড়ে

খায় তারা তোমার মনের খবর রাখে না। আমার খুব ইচ্ছে ছিল, তোমাকে খুব খুশি করব।

আমি জানি, সাবিত্রী বেঁচে নেই। সে আমাকে যাওয়ার সময় বলে গেছে। সে-রাতে চাঁদ ছিল আকাশে। শীত সরে গেছে। সিরসিরে বাতাস। একা বসেছিলুম। চারপাশে উঁচু উঁচু গাছ। রাতের জীবন্ত প্রহরী। দূরে কেউ একজন বাঁশি বাজাচ্ছিল দেশ রাগে। আমি সেই সময়টায় হঠাৎ কী-ভাবে খুব বড়লোক হয়ে গিয়েছিলুম। বড়লোক হলেও মাথাটা বিগড়ে যায়নি। আমার সর্বাধুনিক নতুন গাড়ি চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে। কাল খুব ভোরে এই জায়গা ছেড়ে আরও উত্তরে পাহাড়ের দিকে চলে যাব, নদী পেরিয়ে। কেউ যেন পেছন থেকে আমার দু'কাঁধে হাত রাখল। কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ —'আমি তোমার সাবিত্রী। এইমাত্র ছুটি হয়ে গেল আমার।'

ভয় পাইনি। সামান্য চমকে উঠেছিলুম। আমার জীবনে এ-ঘটনা নতুন নয়। বাবার মৃত্যুর সময়। আমি ঘরে ছিলুম। শ্বাস চলছিল। হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল পৃথিবীর সব বাতাস মৃত্যু টেনে নিয়েছে। কুম্ভক চলছে। দম বন্ধ করে থাকলে যেমন কষ্ট হয় সেইরকম একটা কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ দেখলুম, বাবার দেহ থেকে জ্যোতির্ময় একটা দেহ বেরিয়ে এসে দরজার দিকে চলে যাচ্ছে। আমি পা টিপে টিপে অনুসরণ করলুম। দালানে ঠাকুরদার ছবির সামনে দাঁড়ালেন। তারপর ধোঁয়া যেভাবে ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে যায়, সেইভাবে মিলিয়ে গেলেন; কি অপূর্ব! স্থূল দেহটা ঘরে বিছানার ওপর পড়ে রইল! সেই দিনই পাকাপাকিভাবে বুঝে গিয়েছিলুম—কে আসে—কিছুকাল কোথায় থেকে-কোথায় চলে যায়! এই সংসারের সঙ্গে আসল মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। ঘরে আমি তো ছিলুম, তাঁর প্রিয় সন্তান। একবারের জন্যেও তাকালেন না। ভেতরের মানুষটার সঙ্গে কোনোকালেই যেন তাঁর কোনো পরিচয়ই ছিল না। আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলুম। এই উদাসীনতা যেন আমার গালে একটা চড়—'অ্যাই! কে কার বাবা, কে কার ছেলে!' চোখে জল এল। সবাই ভাবলে আমি সাধারণ কান্না কাঁদছি।

এই দর্শন হওয়ার পরই আমার মন জুড়ে বিশ্রী একটা ভাবনা এল। আমি কি আমার বাবাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতুম না! আমার ব্যবহারে কি কখনো কখনো অবাধ্যতার প্রকাশ ঘটত, উদাসীনতা। খুব বড় একটা চাকরি পেয়ে

প্রবল অহংকারে আমার মাথা কি বিগড়ে গিয়েছিল! জীবনের মান তো আমার কখনো পাল্টায়নি। তাহলে কি আমার বিয়ে! বিয়েতে কি তাঁর অমত ছিল? তাও তো নয়। গভীরভাবে ভাবলে বিদেহীরা আসেন। কোথা থেকে আসেন, কোন লোক থেকে আমি বলতে পারব না।

গভীর রাতে বাবা এলেন। দুধের মতো সাদা পোশাক পরে। বারান্দার দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। একটি কথাই বললেন, 'সাবিত্রীকে মন থেকে তাড়াতে পারলে না?' বলেই, মিলিয়ে গেলেন।

খোঁজ, খোঁজ। মনের খাঁজে-খোঁজে খোঁজা শুরু করলুম। সত্যিই তো রয়েছে। তাকিয়ে আছে আমার দিকে। টানা টানা চোখে। সুন্দর সেই মুখ। 'এখানে কেন?' উত্তর নেই। 'কোথায় আছ তুমি?' এ-প্রশ্নেরও জবাব এল না। আমার বউ অরুণার পাশে শুয়ে পড়লুম।

ঘুম জড়ানো গলায় সে প্রশ্ন করল, 'ছটফট করছ কেন? ঘুম আসছে না?' এখনও নিজেকে চেনা হল না। অন্য একজন নারীকে সঙ্গে নিয়ে আর এক নারীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয়। রাত আড়াইটের সময় অরুণাকে জাগিয়ে কথাটা তো আমি বলতে পারতুম। সাহস হল না। সারা রাত তার পাশে আধো ঘুম, আধো জাগরণে শুয়ে রইলুম। ক্ষণ স্বপ্নে সাবিত্রী এসে দাঁড়াল। টকটকে গেরুয়া বসন। পেতলের মা দুর্গার মতো ঝকঝকে মুখ। হাতে ত্রিশূল। গলায় গোটা গোটা রুদ্রাক্ষের মালা। দীপ্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বারে বারে বলতে লাগল—তুমি ভীরু, ভীরু।

ভীষণ এক অস্বস্তি। কেউ বুঝতে পারে না। দিনের মধ্যে দিয়ে দিন চলে যায় বন্দুক হাতে ভীরু এক শিকারির মতো। হঠাৎ একদিন মনে হল, এ-সব নিয়ে এত ভাবনার কোনো মানে হয় না। কাজে ডুবে যাই। মানুষ জলে ডুবে আত্মহত্যা করে, আমি কাজে ডুবে আত্মহত্যা করি। তখন এক জায়গায় একরের পর একর জমি নিয়ে একটা প্রোজেক্ট চলছিল। তার দায়িত্ব পড়ল আমার ঘাড়ে।

অরুণাকে নিয়ে চলে গেলুম সেই জায়গায়। ভোরবেলা সেখানে নদী থেকে স্নান করে সজল এলো-চুলে মিষ্টি বাতাস উঠে আসে। চতুর্দিকে পুকুরের পর পুকুর। ভোরের জালে রুপোলি মাছের মরে যাওয়ার আনন্দ। গ্রাম্য বাজার। চতুর্দিকে পাতার গন্ধ, শাকের গন্ধ, আনাজের গন্ধ। ফলের

গন্ধ, ফুলের গন্ধ। পৃথিবীর যত সবুজ সব একখানে এসে জড়ো হয়েছে। দূর দূর থেকে সবজি মাথায় নিয়ে মেয়েরা আসছে। নানা বয়সের মেয়ে। পোড় খাওয়া পুরুষেরা। মুখ সব হিসেবের খাতার মতো। সন্দেহের অক্ষর, স্বার্থের কালি। জীবনের ভোঁতা কলম। ভোরে অরুণা আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোত। আমরা হাত ধরাধরি করে হাত দুটোকে জোরে জোরে দোলাতে দোলাতে দুটো বাচ্চা বাচ্চা ভাই বোনের মতো নদীর দিকে চলে যেতুম। ঝকঝকে আকাশ। যেন একখণ্ড আকাশ-কাচ। তরল কাচের মতো খলখলে নদীর জল। তিন-চারখানা পাল মোড়া নৌকো। লম্বা লম্বা বাঁশ। মাঝি-মাল্লাদের কথা, গান, হাসি। দূরে জল কাটতে কাটতে একটা স্টিমার চলে যাচ্ছে। সত্যি, সত্যি আমাদের সম্পর্ক পালটে যেত। কে স্বামী, কে স্ত্রী। আমরা দুই বন্ধু। আনন্দ-স্রোত বয়ে চলেছে আমাদের ওপর দিয়ে। যেন সাঁতার কাটছি।

নদীর ধার থেকে বেড়াতে বেড়াতে আমরা চলে আসতুম বাজারে। টাটকা সকালের মতো টাটকা বাজার। এই বাজারে এসে অরুণা একেবারে বাঁধন-ছেঁড়া হয়ে যেত। এইবার সে পাকা গিন্নি। কী রাঁধবে, কী কিনবে। ঘরে কী আছে, কী নেই। দেখতে দেখতে ঝুলি ভরে উঠছে। বাজারের মেয়ে বিক্রেতারা কেউ ডাকছে দিদি, প্রবীণরা ডাকছে—ও মেয়ে। শুধু কেনাকাটা নয় অরুণা প্রবীণাদের কাছ থেকে রান্নার কায়দাও শিখে নিত। কোন তরকারিতে কী ফোড়ন দিতে হবে। কখনো কখনো, কারও, কারও বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ হত। আমরা যেতুম। দূর কোনো গ্রামে। পুকুরের ধারে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চালা বাড়ি। চালে চালে লতিয়ে উঠেছে তরতাজা লাউগাছ, চালকুমড়ো গাছ। পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়েছে দুরন্ত বালকের দল। ঢেউয়ের ধাক্কায় হাঁসেরা টলটল করে দুলে উঠছে।

শিব-মন্দিরে ঠ্যাং ঠ্যাং করে কেউ ঝোলা ঘন্টা বাজাচ্ছে। পথের ওপর বিছিয়ে আছে শুকনো বাঁশপাতা। আম-জামের ছায়াঘেরা শান্ত গ্রাম। উঠানে তক্তপোশ মাদুর বিছানো। ঝকঝকে পেতলের ঘটিতে টিউবওয়েলের জল। একটু মাটি মাটি গন্ধ। আমগাছের ডালে মৌচাক। ব্যস্ত মৌমাছির আসা-যাওয়া।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অরুণা হয়ে গেল বাড়ির মেয়ে। বাপের বাড়িতে এসেছে। ননদ, ননদিনি, বউদি, মা। আমি যেন জামাই। গাছের ছায়ায় চৌকিতে বসে আছি। বোকা জামাই। লেখাপড়া ছাড়া কিছুই জানি না। বড়

বড়, কঠিন কঠিন অঙ্ক কষতে পারি। বাজারে গিয়ে হিসেব করতে পারি না। আমি নাকি কবে কোনদিন বিরাট একটা ষাঁড়কে দেখে বলেছিলুম—এর যা চেহারা অনেক দুধ দেবে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের হাসির ফোয়ারা। আমি নাকি বিয়ের আগে মেয়েদের দেখলে টেবিলের তলায় লুকোতুম। অরুণা আমাকে সাহসী করেছে। অরুণার যত মজা আমাকে নিয়ে।

ফুলশয্যার রাতে হঠাৎ আমাকে বললে, তোমার কোলে বসব।

আমার প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। বলেছিলুম, মেয়েদের কোলে ছেলেদের, ছেলেদের কোলে মেয়েদের বসতে নেই।

ধ্যাততেরিকা, বলে কোল জুড়ে বসল। মেয়েদের শরীর কি নরম, ঘন, ভারি, উষ্ণ!

তারপর যা করল আরও সাংঘাতিক। ভীষণ একটা চুমু খেয়ে বললে—যাও, তোমার চরিত্র নষ্ট করে দিলুম।

অনেকটা পরে, শেষ রাতের দিকে চরিত্রটা যখন সত্যিই নষ্ট হয়ে গেল, তখন বললে, শপথ কর—আমরা জীবনে কখনো ঝগড়া করব না। আমরা দুজন চিরকালের বন্ধু। আমরা কোনো কিছু গোপন করব না। তারপর অদ্ভুত একটা কথা বললে, আমরা জীবনের মাঠে খেলতে এসেছি। খেলতে খেলতে চলে যাব।

আমার মাস্টার মশাই রোজ সকালে তাঁর স্ত্রীকে পূজার আসনে বসিয়ে পূজা করতেন। অনেকে হাসি-ঠাট্টা করতেন। আমি মাস্টার মশাইকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতুম। এই উপহাস আমার ভালো লাগত না। অরুণা যখন ঘুমিয়ে পড়ত আমি জেগে থাকতুম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সারা শরীর দেখতুম। কোনো অসভ্য কারণে নয়। পরীর গল্প কত শুনেছি—এ যেন সত্যিকারের একটা পরী খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। ভোর হলেই উড়ে চলে যাবে। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, আমাকে বিয়ে করলে কেন?

উত্তর দিলে, তোমার পাশে থাকা দরকার বলে।

কথাটা ঠিক, আমার স্বভাব নৌকোর মতো। ভেসে ভেসে চলে যাই ঘাট থেকে ঘাটে। অরুণা হাল না ধরলে, কী হত আমি জানি না। মাঝে মাঝে আমরা খুব প্রেম করতুম। মাঝে মাঝে। ন'মাসে-ছ'মাসে। সেও যেন এক পূজা। বাঁচতে এসেছি উপোস করে মরব কেন? দেবীর মতো সাজ-পোশাক।

মেঘের মতো চুল। সারা শরীরে সুগন্ধ। নিজের হাতে সাজিয়ে দিত আমাকে। ঘরটা হয়ে যেত স্বর্গ। তারপর ভোরের প্রথম পাখিটা যখন ডেকে উঠত! দূর মসজিদ থেকে উড়ে আসত আজানের সুর। ট্রেন চলে যেত ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে, তখন সে চোখ মেলে তাকাত। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। আমাকে আর একবার টেনে নিত তার বুকে।

চতুর্দিকে সব জেগে উঠছে। এলোমেলো যন্ত্রের শব্দ। ফেরিঘাট থেকে ভোঁ-ভোঁ শব্দে ছেড়ে যাচ্ছে প্রথম লঞ্চ। দিনের ব্যস্ততা শুরু হল। নানা মানুষের নানা রকম বেঁচে থাকা। চারটি নিষ্পাপ শিশু চলে এল। হাতে দুধের ক্যান। অরুণা তাদের দুধ দেবে, পাঁউরুটি দেবে। চোখের তলাটা টেনে দেখবে, শরীরে রক্ত হচ্ছে কিনা। বুকে-বুকে কান রেখে দেখবে সর্দি বসছে কিনা!

তাবপরে পুকুর ধারে গিয়ে খাঁচা খুলে দেবে। বারোটা হাঁস রাজকীয় ভঙ্গিতে হেলে দুলে জলের দিকে এগিয়ে যাবে। ডানা দুটো অল্প মেলে একে একে ঝুপ ঝুপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। খাঁচার ভেতর থেকে উদ্ধার করবে কয়েকটা ডিম। এরপরে কোনো একদিন হাঁসদের বাচ্চা হবে। অবিশ্বাস্য সুন্দর। ছেলেবেলার আলুর পুতুলের মতো। পিঁক পিঁক শব্দে কুঁড়ো খাবে। মায়েদের সঙ্গে পুকুরে যাবে সাঁতার শিখতে। শুরু হবে অরুণার পাহারাদারি। জীবনের শত্রু অনেক। কাক, চিল, বেড়াল, কুকুর।

পুকুরের পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা ওপারে চলে গেছে। জায়গাটার নাম সাহেব বাগান। একসময় সেখানে কয়েক ঘর স্কটিশ সাহেব থাকত। সুন্দর একটা বেকারি এখনো আছে। সাহেবি আমলের বোলবোলা না থাকলেও, কেক, প্যাটিস, প্যাস্ট্রি, পাঁউরুটি তৈরি হয়। এখন যিনি মালিক, তাঁকে সবাই চাকাবাবু বলে ডাকে। এক বুড়ি মেমসাহেব, সবাই দেশে ফিরে গেলেও, তিনি যাননি। জায়গাটাকে ভালোবেসে ফেলেছেন। বেকারিটা করেছিলেন তাঁর স্বামী। এখানেই দেহ রেখেছেন। স্থানীয় চার্চের বেরিয়্যাল গ্রাউন্ডে চিরনিদ্রায় শায়িত। মেমসাহেবের নাম মিরান্ডা। অরুণাকে মেয়ের মতো ভালোবাসেন। নাম রেখেছেন 'হোলি এঞ্জেল'। মেমসাহেবের কাছে অরুণা রান্না শেখে, পিয়ানো শেখে, ছুঁচের কাজ শেখে, ফুল সাজাবার কায়দা শেখে। রোজ সকালে অরুণা মিরান্ডা মেমকে দেখতে যায়। বৃদ্ধার সেবায়

তার খুব আনন্দ। কিছুক্ষণ বাইবেল পড়া হয়। ছোট্ট প্রেয়ার। বৃদ্ধা বলেছেন, 'আই উইল টিচ ইওর সান। ব্রিং এ সান অ্যাজ আর্লি অ্যাজ ইও ক্যান।'

মেমসাহেবকে অরুণা বলতে পারেনি যে, আমাদের কোনোদিনই ছেলে হবে না। একটু অসুবিধে আছে। মেমসাহেব বলেছিলেন, 'শি ইজ মাই ডটার। আই উইল গিভ অল মাই প্রপার্টিস টু হার। মাই এভরিথিং। শি ইজ ডিভাইন।'

প্রপার্টি! বিষয়-সম্পত্তি কে চায়! আমরা চাই না। যা আছে-দুজনের চলে যাবে। টাকার চেয়ে পাখি ভালো, জমির চেয়ে ফুল ভালো, হিসেবের চেয়ে কবিতা ভালো। পুকুরের ওপারে মিরান্ডা লজের দিকে এগিয়ে চলেছে অরুণা। জীবজন্তু তার বন্ধু। বাদামি রঙের একটা কুকুর লেজ নাড়তে নাড়তে চলেছে। কোথা থেকে একটা কালো ছাগল ছানা এসে নাচ দেখিয়ে চলে গেল। গাছের ডালে যত পাখি তাদের ভাষায় বলছে যেন, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত। জাল কাঁধে দুজন আসছিল, তাদের সঙ্গে কি-সব কথা, হাসাহাসি। দূর থেকে আমি সব দেখছি। পাশের একটা চালা থেকে বেরিয়ে এলেন সেই বৃদ্ধা—যাঁর নাম 'নোলক মাসি।' যৌবনে ছিলেন চোখধাঁধানো সুন্দরী। মেটে লাল শাড়ি। ছোট্ট ঘোমটা। টিকালো গোলাপি নাকে একটি সোনার নোলক। যৌবন পালাল। নোলক রইল। মেয়ে বউ হল, মা হল, অবশেষে সকালের মাসি। শক্ত-সমর্থ। রং আছে। রসিকতা আছে। ঘোমটা নেই, যৌবন নেই। চুলে কালো বন্যার ঢেউ নেই। দূর থেকে দেখছি। অরুণা আর মাসি। হাত নেড়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কত কি কথা হচ্ছে। এক সময় অরুণা ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে এল। বুকের কাছে ধবধবে সাদা একটা খরগোশ।

অরুণা ফিরে আসছে। যেন গর্বিত খরগোশ-মাতা। পেছন পেছন আসছে সেই তাগড়া বাদামি কুকুর, আর সেই আমুদে ছাগল। অরুণার ট্রেনিং-এ বিপরীতধর্মী পশুরাও পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। কোন দিন না বাঘ আর গোরুকে একঘাটে জল খাইয়ে ছাড়ে।

অরুণার একটা ক্লিনিক আছে। জীবজন্তু, মানুষ, সকলেরই চিকিৎসা হয় 'অরুণা-পদ্ধতিতে।' আমি কম্পাউন্ডার, অ্যাসিস্টেন্ট। ক্লিনিকে বেডও আছে। একটা বেডে শুয়ে আছে একটা বেজি। বোধহয় কোমায় চলে গেছে। বিষধর সাপ আচমকা শিরে ছোবল মেরেছে। কবিরাজি পদ্ধতিতে চিকিৎসা হচ্ছে।

খরগোশের পা ভেঙেছে। বার লাগিয়ে প্লাস্টার ব্যান্ডেজ করতে হবে।

কম্পাউন্ডার গেট রেডি।

আইসক্রিম খাওয়ার কাঠের চামচে। ব্যান্ডেজ। প্লাস্টার অফ প্যারিস। সে এক বিপর্যয় কাণ্ড। প্লাস্টার করা পা নিয়ে খরগোশের দৌড়াবার ইচ্ছে।

অরুণা বললে, 'উঁহুঁ, উঁহুঁ। ও চেষ্টা একদম নয়। চুপ করে বসে থাক।'

আশ্চর্য! খরগোশটা ঘরের একটা কোণে গিয়ে চুপ করে বসল। খরগোশ সারা দিনই খুচুর-মুচুর খায়। অরুণা একগাদা ঘাস-পাতা এনে সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বললে, 'লক্ষ্মী ছেলে!' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ছেলে কিনা তাই এত লক্ষ্মী। মেয়ে হলে শুনত না।'

অরুণা নারীচরিত্র খুব ভালো বুঝত। আমাদের প্রোজেক্ট এলাকার সমস্ত মেয়ের হাঁড়ির খবর সে রাখত। মেয়েরাও খুব মানত তাকে। অরুণা বলত, মেয়েদের পাল্লায় পড়েই ছেলেরা নষ্ট হয়। পেকে যায়। অসৎ কাজ করে।

সত্যি কথা। কাঞ্চনের মতো একটা জেনুইন ছেলেকে পরস্ত্রীর পাল্লায় পড়ে আত্মহত্যা করতে হল। সেই মহিলাকে আমি চিনতুম। অদ্ভুত ধরনের একটা আকর্ষণ ছিল। ইংরিজিতে যাকে বলে, 'ফেটাল অ্যাট্রাকশন'। পুরুষদের ভেতরে একটা কেন্দ্র থাকে, সেটা বিশ্রীভাবে নড়েচড়ে ওঠে। এইসব মেয়েরা সেটাকে নাড়িয়ে দিয়ে ভীষণ মজা পায়। ভেড়া বানিয়ে আনন্দ, গর্ব। কিছু একটা ছড়িয়ে দিয়ে—আয়, আয়, তু, তু।

সব কথাতেই জ্ঞান দেওয়ার অভ্যাস একটা অসুখ। খরগোশ থেকে নারী। নারী থেকে যৌন-আকর্ষণ। চালাও, চালাও চালিয়ে যাও। Stop it, তুমি গল্প বল। জ্ঞান দেবার চেষ্টা করো না। এখন একেবারে অন্য কথা। চাকা দা এসেছেন। গরম পাঁউরুটি নিয়ে। বেকিং-এর গন্ধ। 'ইস্ট'-মিশ্রিত গমের মিষ্টি গন্ধ।

এসেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'কাল কেমন থাকবেন?'

'ভালোই থাকব।'

চাকা দা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'কী করে জানলেন?'

'আজকে শরীরে কোথাও কোনো অসুবিধে নেই, হঠাৎ কাল খারাপ হবে কেন?'

চাকা দা ট্রাউজারটা গুটিয়ে ওপরে তুলে নিজের ডান পা-টা দেখালেন, 'কী দেখছেন?'

'পোড়া দাগ। বেশ ভালোই পুড়েছিল। গর্ত হয়ে আছে।'

'তাহলে ঘটনাটা শোনা যাক। শীতকাল। সকাল হল। রোদ উঠল। চারদিকে কিচির মিচির পাখি। মহিমের কাঠগোলায় করাতকল—ছ্যাঁ, ছ্যাঁ করে তক্তা ফাঁড়ছে। নিত্যানন্দ খুঞ্জুনি বাজিয়ে হরে কৃষ্ণ করছে। আমাদের মিরান্ডা মেম মাঠে মর্নিংওয়াক করছে। মিলিটারি ব্যারাকে টেস্ট ফায়ারিং শুরু হয়েছে। বেকারির চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বেকিং-এর গন্ধ।'

অরুণা ছেলেমানুষের মতো গল্প শুনতে ভালোবাসে। হাঁ করে চাকাবাবুর গল্প শুনছে। হাতে খুরপি। একটু পরেই বাগানের কাজে নামবে। এই কাজেও আমি অ্যাসিস্টেন্ট। চাকাবাবুর নামের উৎপত্তির কারণ জানা গেছে। ভদ্রলোকের 'টাইটেল' চক্রবর্তী। মিরান্ডা মেম সেটাকে করলেন 'চাক্'। চাক থেকে চাকা।

চাকাবাবু বলছেন, 'বড়দিনের বাজার। কেক, প্যাস্ট্রি, রুটির এত অর্ডার সাপ্লাই দিয়ে শেষ করা যাচ্ছে না। যত চাপ বাড়ছে মিরান্ডা মেমের মেজাজ তত চড়ছে। এক বালতি জল। ইমারসান হিটার। ঝপ করে চান সেরে বেকারিতে ঢুকব। মিরান্ডা মেমের চিৎকার কানে আসছে—চাক আর য়্যু ডেড। ক্রমশ গলা চড়ছে, ব্লাডি চাক, আর য়্যু ডেড। কথায় কথায় সাহেবদের এই ব্লাডি শব্দটা শুনলেই মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ঠিক আছে, তোমরা আমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে মানুষ করেছ। লেখাপড়া শিখিয়েছ, তা বলে কথায় কথায় ব্লাডি বলবে।

'রাগে অধৈর্য হয়ে ইমার্সান হিটারের কর্ডটা ধরে একটানে বালতির জল থেকে তুললুম, দোল খেয়ে এসে লাগল পায়ের 'শিন-বোনে'—চামড়া পোড়া, মাংস পোড়ার গন্ধ। হয়ে গেল ভালো থাকা। মিরান্ডা মা খুব সেবা করেছিল। মেমসাহেবের ভেতরে খুব ভালো একটা মাদার আছে। আর মা তো ছেলেকে শাসন করবেই।'

আমি বললুম, 'এটা দুর্ঘটনা।'

'আরে মশাই সবই ঘটনা, মনের মতো না হলেই দুর্ঘটনা। মুরগিকে রোস্ট করা হচ্ছে। মুরগির জীবনে এটা দুর্ঘটনা। যারা খাবে তাদের কাছে এটা মহাভোজ। অতএব, কখন কেমন থাকব গড নোজ।'

আমরা বাগানে বেরিয়ে এলুম—গার্ডেন অরুণা। চতুর্দিকে ফুলের বাহার। মরসুমি ফুল। আমার কাজ হল সেচ। পাম্প চালাব। জল গড়িয়ে আসবে একের পর এক নালি দিয়ে কুলকুল করে নেচে নেচে। সে এক আনন্দের দৃশ্য। অরুণা গাছের গোড়ায় গোড়ায় উবু হয়ে বসে খুরপি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করবে। মাটি আলগা করবে। এই বাগানে ছ-সাতটা সুন্দর প্রজাপতি আছে। অরুণার চুলে এসে বসবে। তাকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে উড়বে। বাপরে! কি ভালোবাসা। অরুণাকে সবাই ভালোবাসে।

চাকাবাবু বললেন, 'ওই দেখুন।'

দোতলার কার্নিসে একটা থান ইট। বললুম, 'ইট'।

'হ্যাঁ, আস্ত একটা থান ইট। আর ঠিক এই জায়গাটায় একটু পরেই আপনারা গার্ডেন চেয়ারে বসে ফুল দেখতে দেখতে চা খাবেন।'

'হ্যাঁ, এটা আমাদের একটা ছোট্ট বিলাসিতা।'

'জানি। আর ঠিক মাথার ওপর কার্নিসে আস্ত একটা ইট। ইটটার ভীষণ ইচ্ছে আপনাদের মাথায় পড়ার। রোজই একটু একটু করে সরছে। সেই দিনটার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মানুষের নিয়তি এইভাবেই অপেক্ষা করে থাকে। বাঘ যেমন ওত পেতে থাকে শিকারের জন্যে। রোজ সকালে এক পাল হরিণ ঘাস খেতে আসে। কবে কোন দিন কোন হরিণ বাঘের পেটে যাবে বাঘও জানে না, হরিণও জানে না। কেউ জানে না। Not even God. এখন যে-কথা মেমসাহেব আজ রাতে আপনাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন। সব্বাইকে। Sharp at Seven P.m.'

চাকাবাবু চলে গেলেন। অরুণা ওদিক থেকে এদিকে এল। মাথায় খড়কুটো। খোঁপায় একটা বড় ফড়িং। ফর্সা ডান গালে মাটি। নাকের ডগায় ফুলের রেণু। ও কার্নিসে ইটের কথাটা শোনেনি। বললুম। ইটটার দিকে তাকিয়ে বললে, আমাদের মাথায় পড়ার কোনো চান্স নেই। দেখা হলে তোমার চাকাবাবুকে বলবে, 'কেন পড়বে?'

সেই রাতের ডিনার পার্টি ডায়েরিতে লিখে রাখার মতো। আমার এক বাস্তববাদী বন্ধু আমাকে মুখের ওপর কড়া ভাষায় প্রশ্ন করেছিল, 'তুই কেন লিখিস, কার জন্যে লিখিস, কি লিখিস।' এই প্রশ্নে এতটাই স্তম্ভিত হয়েছিলুম,

সেই মুহূর্তে কোনো উত্তর দিতে পারিনি। অনেক পরে যখন উত্তর খুঁজে পেলুম, তখন সেই প্রশ্নকর্তা মারা গেছে। এই প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন,

কোন্ সুদূর হতে আমার মনোমাঝে
বাণীর ধারা বহে-আমার প্রাণে প্রাণে।
আমি কখন শুনি, কখন শুনি না যে,
কখন কী যে কহে—আমার কানে কানে।।
আমার ঘুমে আমার কোলাহলে
আমার আঁখি-জলে তাহারি সুর,
তাহারি সুর জীবন-গুহাতলে
গোপন গানে রহে—আমার কানে কানে।।
কোন্ ঘন গহন বিজন তীরে তীরে
তাহার ভাঙা গড়া ছায়ার তলে তলে
আমি জানি না কোন দক্ষিণ সমীরে
তাহার ওঠা পড়া—ঢেউয়ের ছলোছলে।
এই ধরণীরে গগন-পারের ছাঁদে সে যে তারার সাথে বাঁধে,
সুখের সাথে দুখ মিলায়ে কাঁদে
'এ নহে এই নহে—নহে নহে, এ নহে এই নহে'—
কাঁদে কানে কানে॥

সে তো নেই, বলব কাকে। আমার আর এক বাল্যবন্ধু কুমার উপহাস করে বলেছিল, এত বউ বউ করিস কেন, লোকে যে স্ত্রৈণ বলবে। তা ঠিক। লোকের আর বলতে কী? একটা মেয়েকে উথাল-পাথাল ভালোবাসলে, বলবে প্রেমিক। তাকে বিয়ে করে একই রকম ভালোবাসলে বলবে, স্ত্রৈণ। ভালো ভাই।

আমি আমার জীবনকথা লিখে রেখে যাই, সুখের সাথে দুখ মিলায়ে। জীবনের ভেতর যে জীবন থাকে, সেই জীবন সকলেরই এক। আমার চিনি, আমার গুড়, তোমার চিনি, তোমার গুড় এক। আমার চোখের জল, তোমার চোখের জল এক। এক জীবন, এক মরণ।

আবার জ্ঞান?

সরি! একটা কথা বলি, সব গল্পই ইচ্ছাপূরণ, যা পাইনি তা পাওয়ার কাহিনি। প্রেম, ভালোবাসা, সুখী-সম্পন্ন পরিবার। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গান-গল্প। আমি পাইনি, তা তুমি পেয়েছ—তোমার গল্পটাই শুনি। কেউ না শুনুক নিজের গল্প নিজেই শুনি, পেছনের পথ দেখি—আসছে সে আসছে পেতে পেতে, হারাতে হারাতে। লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি। কখনো হাসছে, কখনো চোখে জল।

অরুণা রেডি। বুকের কাছে পায়ে প্লাস্টার সেই খরগোশটা। আর ফ্রক পরা সেই সুন্দর মেয়েটা, যার নাম শিখা। সাহেবের তৈরি সাহেবি কেতার বাড়ি। দেখলে দুঃখ হয়। কোন সুদূর থেকে একটি ছেলে, একটি মেয়ে ভাসতে ভাসতে ভারতে এল। ভাগ্যের সন্ধানে। কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি। আর প্রেম—তুমি আমার, আমি তোমার। আর একটি ক্রশ। ক্রুশবিদ্ধ মানব-ত্রাতা-পাতা-সংহিতা জিশু। একটি বাইবেল। নীল কাচের আধারে নিষ্কম্প মোমবাতির শিখা। ধীরে ধীরে এদেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয়। বন্ধুত্ব। ধর্ম আর লোকাচারের সঙ্গে মিলেমিশে যাওয়া। সময়ের ঘড়ি টিক টিক। বয়েস বাড়ছে। সময় ফুরোচ্ছে। গাছের মতো শেকড় নামছে মাটির নীচে আরও নীচে। আমাদের দেশে, দেশিগাছের সঙ্গে অনেক বিদেশি গাছও মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

ভেতরটা একেবারে চার্চের মতো। এদিকে-ওদিকে একশো বাতির রোশনাই। কোনো কোনো বাতির তলায় বাহারি কাচের পাত্রে জল। সেই জলে টলটলে আলোর শিখা। ক্রুশবিদ্ধ খ্রাইস্ট। তলায় ঝকঝক করছে কাঠের প্ল্যাটফর্ম। একসার ছোট ছোট বাতি, যেন আলোর শিশু হামাগুড়ি দিচ্ছে। কি অপূর্ব পরিবেশ। অনেকদিন থেকেই, মাঝেমাঝেই একটা ইচ্ছা প্রবল হয়, আমি বেশ খ্রিস্টান হয়ে যাব। চার্চের সার্ভিসে যাব। অরুণা গাউন পরবে। গাউন পরলে স্লিম চেহারার মেয়েদের কি সুন্দর দেখায়!

বাইরের বাগানে সুন্দর, সুন্দর বসার জায়গা। আধো আলো আধো অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে বেশ্ লাগছিল। হিম পড়ছে, তা পড়ুক। রাতের ফুল ফুটেছে কোনো একটা জায়গায়। গন্ধে মাত করে দিচ্ছে। হয় মালতি, না হয় হাস্নুহানা। বিশাল বড় একটা জলপাই গাছের তলায় থকথকে অন্ধকার। সেখানে একটা দোলনা। মাঝে মাঝে দুলে উঠছে। যেন কেউ দোল খাচ্ছে।

স্পষ্ট কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। না পেলেও কেউ একজন আছে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লুম। ভয় পেয়েছি।

অনেকদিন পরে আবার যেন তাকে দেখতে পেলুম। সে রাত্রির চেয়েও কালো। সে জমাট অন্ধকার। আমার মাকে নিতে এসেছিলেন। সেই রাত। গঙ্গার ধারে পৈতৃক বাড়ি। আমি তখন ছাত্র। দোতলার গঙ্গার দিকের ঘরে বসে পড়ছি। সামনেই অন্ধকার গঙ্গা। ওপারে জুট মিলের বাগানে পুট পুট করে জ্বলছে সার সার আলো। সারা রাতের সারি সারি তপস্যা। বড় বড় চিমনি অন্ধকার আকাশে এক একটি খাড়া দৈত্য। নীচের ঘরে মেয়েরা সব একসঙ্গে খেতে বসেছে। হাসি আর গল্প। টেবিলে ঢাকা টেবিল-ল্যাম্পের আলো শুধুমাত্র বইটাকেই আলোকিত করেছে। ঘরের বাকি জায়গায় ছায়া ছায়া অন্ধকার। এক পাশে খালি একটা চেয়ার। কখনো-সখনো মা ওই চেয়ারে এসে বসে—'তোর সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে যাই।' মা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সব কথাই হয়। সব রকমের ইয়ারকি।

হঠাৎ মনে হল চেয়ারটা খালি নেই। কেউ একজন বসে আছে। জমাট একটা অন্ধকার। সাহস করে প্রশ্ন করলুম, জানি কেউ নয়, তবু করলুম, 'কে'?

আশ্চর্য! উত্তর এল, 'আমি'।

'কে আপনি'

'আমি শেষ।'

'তার মানে?'

'সবাই শুরুটা জানে, শেষটা জানে না। আমি সেই শেষ। যারা বেঁচে আছে তারা আমার নাম রেখেছে, মৃত্যু।'

'এখানে কেন?'

'নিতে এসেছি।'

'কাকে?'

'তোমার মাকে।'

'অসম্ভব! আমার সুস্থ, সুন্দর মাকে আপনি কী ভাবে নেবেন?'

'আর মাত্র তিরিশ সেকেন্ড। দুঃখ কোরো না।'

চেয়ার খালি। অন্ধকার মূর্তিটা আর নেই। নীচের ঘরে প্রবল হাসির রোল। পরমুহূর্তেই প্রবল কাশির শব্দ। দম বন্ধ করা কাশি। 'জল, জল, জল'।

তির-বেগে নীচে। ঘরের মেঝেতে মা শুয়ে। মৃত্যুর হাত ধরে প্রাণ চলে গেছে অনন্তের ছায়াপথে। সে কোন তীর্থ রে ভাই! কঙ্খল, হরিদ্বার, স্বর্গদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, সঙ্গম।'

দাঁড়িয়ে আছি শ্মশানে। আমার চেয়েও উঁচু চিতা। মা শুয়ে আছেন। 'ও মা!'

উত্তর নেই। কে কার মা! কে কার ছেলে! আগুন আর ছাই।

জীবনটা থেবড়ে গেল। অরুণা এসে টেনে তুলল, 'বিশ্বাস কর, আমি তোমার মা। কাউকে বোলো না। হাসবে। ব্যঙ্গ করবে।'

মিরান্ডা মেমকে বলতে পারিনি, কেন আমাদের সন্তান হবে না। একটা আশ্চর্য কথা এখানে সাহস করে লিখে রেখে যাই। পৃথিবীতে বিশ্বাসী মানুষও তো আছে। অরুণার স্তন দুগ্ধে পূর্ণ। সে-দুগ্ধ আমি পান করি। কোনো কামভাব জাগে না। না, এসব অন্তরঙ্গ কথা! এসব আমার মধ্যেই থাক। কামরূপে এক ভৈরবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে এই রহস্যের কথা বলে জানতে চেয়েছিলুম, কী করে এমন হয়! সাধিকা বলেছিলেন, ভাগবত পড়ে দেখ, বাৎসল্যভাবে সব সময় থাকার ফলে মাতা যশোদার বুকের কাপড় সবসময় স্তন-দুগ্ধে ভিজে থাকত। মাতৃভাবাপন্ন সমস্ত রমণীর স্তনেই দুধ থাকে। পিশাচিদের থাকে না। তাদের স্তনের গঠন হয় বাতাসশূন্য বেলুনের মতো। পৃথিবীতে এসেছ শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই জায়গাটা পড়ে দেখ। বুঝতে পারবে কারা তোমাকে ঘিরে আছে। কত রকমের অশুভ শক্তি। জোরে পড়।

ভূচরাঃ খেচরাশ্চৈব কূলজাশ্চোপদেশিকাঃ॥
সহজা কুলজা মালা ডাকিনী শাকিনী তথা।
অন্তরীক্ষচরা ঘোরা ডাকিন্যশ্চ মহারবাঃ॥
গ্রহভূতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্বরাক্ষসাঃ
ব্রহ্মরাক্ষসবেতালাঃ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ॥

আর না; এইবার বাংলায় শোন, ভূচর খেচর, কূলজা, অর্থাৎ নদী বা সাগরকূলে যারা থাকে। উপদেশিকা মানে ক্ষুদ্র দেবতা, সহজা মানে সহোদর, কুলজা, দুষ্ট দেবতা, মালা, ডাকিনী, শাকিনী, ঘোরা, অন্তরীক্ষচরা, অর্থাৎ উপদেবতা, মহারবা ডাকিনী, গ্রহ, ভূত, পিশাচ, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, ব্রহ্মদৈত্য, বেতাল, কুষ্মাণ্ড ও ভৈরবাদি—এদের অশুভ প্রভাব থেকে বাঁচার উপায় দেবী

কবচ পাঠ। জগতের ঈশ্বরী, ভুবনেশ্বরীর রূপ কী-রকম জান,

বালরবিদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং
তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম।
স্মরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং
প্রভজে ভবনেশীম॥

প্রথম সূর্যের প্রভা, অর্থাৎ কাঁচা হলুদ। চন্দ্র যাঁর মুকুটমণি। স্তন দুটি অতি উন্নত। দেবীরা সবাই উন্নত স্তনযুক্তা। পীনোন্নত ঘটস্তনীং। ঘটের মতো স্তন। স্নেহময়ী, দয়াময়ী। স্তনের গঠনের ওপর নির্ভর করে নারীর স্বভাব।

এক সময় ডিনার শেষ হল। অতি চমৎকার। টেবিল পরিষ্কার হওয়ার পর ড্রয়ার খুলে মিরান্ডা মেম একটা দলিল বের করলেন। ইংরিজিতে টাইপ করা। দলিলটি টেবিলের ওপর রেখে 'আমার সব কিছু আমার অরুণাকে দিয়ে গেলুম। আচ্ছা! গুড বাই, গুড নাইট, গড ব্লেস ইউ অল।' মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটল। মিরান্ডা ঘুমিয়ে পড়লেন। চির-নিদ্রা। ঘরের সব কটা বাতি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পর্দা দুলিয়ে একটা বাতাস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চাকাবাবু অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি দ্বিতীয়বার আমার মাকে হারালুম। এই পৃথিবীতে আমার আর কেউ রইল না।'

অরুণা কাছে এগিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার দিকে তাকান। ওর মা, আপনার মা। সব মা আমার ভেতরে। ভুলে যাবেন না, এক বছর আগে এই ঘরে বসে কথা হয়েছিল আমরা একটা অরফ্যানেজ করব, যার নাম হবে মিরান্ডা হোম। উঠুন। অনেক, অনেক কাজ আছে বাকি।'

বাগানে বেরিয়ে এলুম। ঘন কুয়াশা নেমেছে। দোলনাটা আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। জীবন দোলনা কেমন করে মৃত্যুর দোল খাবার জায়গা হয়? আরে বোকা! জীবনই তো মৃত্যু! জীবন দোলায় মৃত্যুর ঝুলন উৎসব। রাধা আর কৃষ্ণ এক সঙ্গে দুলছেন।

মৃত্যুকে একবার প্রশ্ন করেছিলুম, 'হ্যাঁ গা, তুমি বারবার আমার কাছেই আস কেন?'

মৃত্যু বলেছিল, 'যে আমাকে ভালোবাসে, যে আমাকে ভয় পায় না, আমি

সেই বন্ধুর কাছে বারে বারে আসি। তার মনটাকে শক্ত আরও শক্ত করে দেবার জন্যে। মৃত্যুকে না জানলে জীবন পরিষ্কার, স্বচ্ছ হয় না। বোঝার মতো ঘাড়ে চেপে থাকে। পৃথিবীতে মানুষ বেড়াতে আসে, চিরকাল থাকার জন্যে আসে না। আমি কৃষ্ণ, আমিই কালী। আমার হাতে কখনো বাঁশি, কখনো অসি।

আমার তো বয়েস হল। অনেক বয়স। বিশ্রী রকমের বুড়ো। মিরান্ডা হোমের অফিসে একটা সাদা টুপি মাথায় দিয়ে, সাদা পোশাক পরে বসে আছি। চাকাবাবু নেই। খেলা ফেলে চলে গেছেন। মৃত্যু আমাকে সুন্দর একটি উপমা দিয়ে জীবন বুঝিয়েছিল। পেট্রোল পাম্পে গাড়ি। পেছনের ক্যাপটা খুলে নল দিয়ে ট্যাঙ্কে তেল ভরছে। গাড়ি চলবে, তেল ক্রমশ ফুরোবে। ভগবানের ওয়ার্কশপে মানুষ যন্ত্রে শ্বাস ভরে দেওয়া হয়। শ্বাস ভগবানের নিশ্বাস মানুষের। কতবার সে শ্বাস ফেলবে, সে হিসেব তাঁর কাছে। তেল ফুরোলে পাম্প আছে, শ্বাস ফুরোলে গ্যারেজ। যোগীরা শ্বাস কম খরচ করেন, তাই অনেক দিন বাঁচেন। ভোগীরা বেহিসেবি।

অরুণা যাওয়ার সময় বলে গেল, মন খারাপ করবে না। বাইরে আমি নেই, তোমার ভেতরে আমি আছি। তুমি যখন লিখতে পার, লিখবে। অনেক রাতে আমাকে শোনাবে 'আমাদের কথা।'

তবু মনে হয়; আমি হড়কে গভীর কোনো খাদে পড়ে যাচ্ছি। ধরার কিছু নেই। সামনের দেয়ালে মিরান্ডা মেম আর অরুণার ছবি। দুজনেই মাদার। মাদার মিরান্ডা, মাদার অরুণা। একটি মেয়েকে অরুণা তৈরি করে দিয়ে গেছে, তার নাম পামেলা। সুন্দর মেয়ে। আদিবাসী খ্রিস্টান। শিখাও বেশ তৈরি হয়েছে।

পথের মেয়েরা প্রাণখুলে হাসছে। সমবেত প্রার্থনায় জীবনের গান ভাসছে।

আমি অরুণার জন্যে একের পর এক লেখা কালের পাতায় লিখে চলেছি—'আমাদের কথা।' সেসব লেখা পামেলার খুব ভালো লাগে। পামেলা আমাকে বাবা বলে—Father you are my father জীবনটা খুব একা হয়ে যেত, যদি সে না থাকত।

এক

আলমারির একেবারে ভেতর দিকে একটা মাঝারি মাপের ব্যাগ। ভেলভেটের কাপড় দিয়ে তৈরি। কোনো সন্দেহ নেই, খুবই সুন্দর। খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একটি নারীর জগৎ। এক জোড়া দুল, বালা। সিল্কের রুমাল। রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো চিরুনি। ছোট্ট একটা আয়না। ছোট্ট একটা আতরের শিশি। গোলাপি রঙের চেলির টুকরো দিয়ে বাঁধা অবশ্যই কোনো মাঙ্গলিক। বেরল এক তাড়া চিঠি। এক পাতা সেফটিপিন। কিছু রুপোর টাকা। সব কিছুকে জড়িয়ে আছে সুন্দর একটা গন্ধ।

বাইরের বারান্দায় গ্রীষ্মের দুপুরের রোদ ক্লান্ত ফেরিঅলার মতো শুয়ে আছে। বাতাস যেন জ্বরের রুগির নিশ্বাস। অনেক দূরে কেউ কাঠ কাটছে। যেন বিচ্ছেদের শব্দ! কে যেন কাকে বললে, 'আড়াইটে'। বোধ হয় সময় জিজ্ঞেস করলে। বেশ তেজি কণ্ঠস্বরে কোনো মহিলা বললেন, 'পারব না।'

জিনিসগুলো বিছানার ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। গল্প করতে চাইছে। একজোড়া রুপোর পাঁয়জোর হাঁটার জন্যে পা খুঁজছে। দরজা খোলার শব্দ হল। কাজের মেয়েটি এল? এখনি ঝাঁটার শব্দ উঠবে। বড় ব্যস্ত। বেড়ালটা পায়ে পায়ে ঘুরছে। ম্যাও, ম্যাও। বেড়ালরা মেয়েদের ভালোবাসে মেয়েটি যতক্ষণ থাকবে সমানে বেড়ালটার সঙ্গে কথা বলে যাবে। জীবনের কথা। দুঃখের কথা। বিয়ে হয়েছিল। স্বামী ছেড়ে পালিয়েছে। জানলায় পর্দা লাগানো হল না। খুব জোরে বন বন করে ঘোরে, সেই পাখা কেনা হল না। কেনা হল না টিভি।

বাসন মাজার পর এই ঘরে এসে আমাকে খানিক বকাবকি করবে। আমার বহু রকমের অপরাধ। ভাত ফেলেছি। মাছ পরিষ্কার করে খাইনি। এমন বেগার-ঠেলা খাওয়া তার সহ্য হয় না। আমার ওপর তার কোনো অধিকার থাকলে দেখিয়ে দিত মজা।

সব সময় ফিটফাট। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সুন্দর খোঁপা। মাঝে মাঝে চশমা পরে, তখন মনে হয় কলেজের ছাত্রী। নিজেই ব্যবস্থা করে বিয়ে করেছিল। সেই ছেলেটা বোকা, যে এমন একটি মেয়েকে ছেড়ে চলে গেছে! একে

আর একটা সংসার খুঁজে দিতে হবে। সে কি সহজ কাজ! বাড়ি, ঘর, মানুষজন সবই আছে। বেশি, বেশিই আছে। নেই সংসার। ফুল আছে মালা নেই।

জানলা আছে আকাশ নেই।

রান্নাঘরের দিক থেকে তার গলা ভেসে এল, 'চা বসাচ্ছি।'

কিছু পরেই ভেসে এল ধমক, 'কিছুই আর দেখ না! দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছ! যা চিনি আছে, কোনো রকমে এই একবার হবে। চা প্রায় শেষ। দুটোই আজ আনবে।'

একবার ওদিকে তাকালে আমি তার পেছন দিকটা দেখতে পাব। মানুষের সামনের দিকে জনতা। পেছন দিকে নির্জনতা। নিঃসঙ্গ, নিরালা একটা পিঠ সামনেটাকে 'ব্যানার'-এর মতো আড়াল করে রেখেছে। মানুষ সামনের দিকেই বাঁচে। চেবানো সময় আখের ছিবড়ের মতো পেছনে এসে জমে।

আবার হল বকুনি, 'গ্যাসও তো গেছে। ফিরির ফিরির করছে। লিখিয়েছ, না লেখাওনি? জানি, অত উপকারী মানুষ তুমি নও। দুধ কোথায়?'

সাহস হল না বলার, ঘন্টাখানেক আগে বেড়ালে চেটেপুটে খেয়ে গেছে, বাজনা বাজিয়ে বাজিয়ে। আমি বসে বসে দেখেছি, সুন্দরীর মুখে কি সুন্দর একটা তৃপ্তি ফুটে উঠছে।

ওদিক থেকে একটা আক্ষেপ ভেসে এল, 'নাঃ, এ-লোকটাকে নিয়ে আমি আর পারি না। দেখতে হবে না—বেড়ালকে খাইয়েছে! ওনার গতর দিন দিন বাড়ছে, এনার দিনকে দিনকে কমছে। জানি, জানি নিজে মরে আমাকে মারবে। এনারা একটা জিনিসই জানেন—যাঃ, মরে গেলুম। নাও, এবার তুমিও মর।'

বিছানার চাদরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা জিনিসগুলো যেন কথা বলছে! ভালোবাসার একই রকম ভাষা। তটের ওপর সমুদ্রের ঢেউ একই ভাষায় আছড়ে পড়ে। পাখির ডানা একই রকম শব্দ তুলে আকাশে উড়ে যায়।

মসৃণ সকালের মতো দু'গেলাস লাল চা হাতে নিয়ে সে ঘরে ঢুকল। কপালের ঘামের সঙ্গে দু-এক গাছা চুল জড়িয়ে আছে। কপালের ঘামের

সঙ্গে মেয়েদের চুলের এই একই রকম সম্পর্ক। বড়, বড় দুটো চোখ যেন সরলতার সরোবর। একমাত্র মানুষের চোখেই সেই আশ্চর্য জিনিসটা থাকে—'কালো আলো'।

ছড়ানো জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে সে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'আবার তুমি কাঁদতে বসেছ!'

বলার সঙ্গে সঙ্গে তারই চোখ দিয়ে দু'দানা জল গড়িয়ে পড়ল।

আসলি 'বসরাই মুক্তো' মেয়েদের চোখে থাকে। দুঃখের অক্ষর—'মুক্তো'। দুঃখের পথেই 'মুক্তি'!

দুই

বন্যার সময় জন্মেছিল, তাই মা নাম রেখেছিল বন্যা। সে চলে যাওয়ার পর আমি চুরমার হয়ে গেছি। বন্যাই আমার একমাত্র ভরসা। নিজের ওপর আমার কোনো আকর্ষণ নেই। তিন-চার বার মরতে মরতে বেঁচে গেছি। প্রথমবার অন্যমনস্ক রেললাইন পেরতে গিয়ে। ইঞ্জিনের বাতাসের ধাক্কায় দশ হাত দূরে ছিটকে আর একটা লাইনে গিয়ে সপাটে পড়লুম। সে-লাইনেও একটা ট্রেন আসছিল। কীভাবে যে বাঁচলুম!

দ্বিতীয়বার অসাবধানে কাপড়ে আগুন ধরে গেল মন্দিরে। একজন ঠেলে পুকুরে ফেলে দিলে। আগুনের হাত থেকে বাঁচলেও, আর একটু হলে জলে ডুবে মরছিলুম। একটি ডাকাবুকো মেয়ে চুলের মুঠি ধরে আমাকে ডাঙায় তুললে। বুকে চাপ দিয়ে জল বের করলে। প্রচুর খেয়েছিলুম—প্রাণ খুলে। মুখে মুখ দিয়ে ফুসফুস ফোলাবার চেষ্টা করছিল। চোখ মেলে তাকাতেই আকাশের মতো দুটো চোখ। ঠোঁট থেকে ঠোঁট তুলে নিতে কেন দেরি করছিল। কেন তার শরীরটা আমার শরীরের ওপর এলিয়ে দিয়েছিল! মরতে বসে এমন মহাজীবনকে এগিয়ে দিল আমার দিকে। মৃত্যুর চুম্বনে জীবনের চুম্বন।

সে চলে গেল। সে তো যাবেই; কিন্তু যায়নি। গভীর রাতে আমার ঘুম কেড়ে নিল। সাঁতারুর মতো দীর্ঘ শরীর। দৃঢ় মুখ। ঝলমলে স্বভাব জ্বলজ্বলে

চোখ। আমসত্ত্বের মতো পাতলা ঠোঁট। ভুট্টার দানার মতো সার সার সাজানো দাঁত।

তৃতীয়বারের মৃত্যু এইটাই। আমি ডুবেই গেছি, কেবল কোথায় ডুবেছি জানি না। কোথায় সে থাকে! মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরে এলে মৃত্যুটা জীবনের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে চিরকাল। রাতের পর রাত সেই মেয়েটিকেই আমি স্বপ্ন দেখি। দু-কাঁধের পাশ দিয়ে চুল ঝুলে পড়েছে সামনে। পাথর কোঁদা মুখ। খাড়া নাক। চোখে হিরের ঝিলিক। শরীর ঘিরে আত্মপ্রত্যয়। বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হল না। মন্দিরের পুরোহিতের মেয়ে সে। নাম তার নির্মলা।

ফাল্গুনের রাতে সে আমার জীবনে এল। এতদিন খোলা আকাশের নীচে পড়েছিলুম। চলে এলুম নীল এক চন্দ্রাতপের তলায়। ইকমিক কুকার ছুটি পেল। ছড়ানো জিনিসপত্র ঠিক ঠিক জায়গায় বসে গেল। বিছানায় টান টান চাদর। পরিচ্ছন্ন বালিশ। আদেশ আর নির্দেশে জীবন ভরে গেল। নতুন পাতা এল, কুঁড়ি এল, ফুল এল। ফল আসার সময় তো মিলল না।

কদম আর কৃষ্ণচূড়া গাছে ঘেরা সেই আশ্রম। যে-আশ্রমে মাতাজিরা থাকেন। সেই আশ্রম থেকেই নির্মলা বন্যাকে এনেছিল বন্যার ভেতর আমি নির্মলার ছায়া দেখি, নির্মলা স্নান সেরে ছোট্টবাড়ির ছোট্ট উঠানের তারে শাড়ি শুকোতে দিচ্ছিল। আমি তার খুব কাছে এগিয়ে গেলুম। এতটাই কাছে যে তার শরীরের সাবানের গন্ধ পাচ্ছিলুম। সে কিছু বললে না। এতটুকু অবাক হল না। চোখে ঘৃণা এল না। শুধু বললে, 'ঘরে চল'। নিজেই জানলা সব বন্ধ করে দিলে। দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলে।

স্কুলের সেক্রেটারি থমথমে গম্ভীর মুখে বললেন, 'রেজিগনেশান এনেছেন?'

'অবশ্যই'।

'এ-কাজ কেন করলেন? নামকরা একজন শিক্ষক একটা ঝিকে বিয়ে করলেন?'

'ঝি কাকে বলে?'

'বাসন মাজে, ঘর পোছে।'

'নিজের মেয়েকেও তো অনেক সময় ঝি বলে।'

'আমি তর্ক করতে চাই না। আপনি চরিত্রহীন।'

'আপনার একজন রক্ষিতা আছে।'

'ইউ গেট-আউট।'

সব বাঁধা ছাঁদা হয়ে গেল। বন্যা জিজ্ঞেস করলে, 'আমরা এখন কোথায় যাব?'

'পথে।'

'কোথায় থামব?'

'সেই দেশে, যেখানে মানুষ আছে।'

বাসগুমটির টিকিট বিক্রেতা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়?'

বলতে পারলুম না। শুধু বললুম, 'শেষে।'

[সমস্ত লেখাই আমি জানলার ধারে একটা টেবিলে ফেলে রাখতুম। কেমন একটা ধারণা হয়েছিল, গভীর রাতে তারার আকাশ থেকে অরুণা নেমে আসবে ছায়া শরীর নিয়ে। চেয়ারটায় বসে পড়বে। ভোর হলেই মিলিয়ে যাবে। এই লেখাটা তাকে পড়াবার ইচ্ছে ছিল না, যদি ভাবে আমার দেহবাসনা ছিল। পরে ভাবলুম, আমার বিষয় তো ভালোবাসা। ভালোবাসার রচনাই তো সংসার। পামেলা এই লেখাটা পড়ে বলেছিল, 'আমি তোমার বন্যা। তুমি কি জান, তোমার জন্যে আমার একজন বয় ফ্রেন্ড ছিল, তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। অরুণাদি যাওয়ার সময় বলে গেছে তোমাকে বিয়ে করতে।' আমি চমকে উঠেছিলুম।]

তিন

গোধুলিয়ার সেই পানের দোকান। আরও জমজমাট। জোয়ারের জলের মতো জনসংখ্যা বেড়েছে। অসংখ্য তীর্থযাত্রী। হাঁটতে গেলে পায়ে পায়ে জড়াজড়ি। গাড়ি, রিকশা, ঠ্যাং ঠ্যাং টাঙ্গা। নবাবি আমলের লোকজনও প্রচুর। লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি, শেরওয়ানি, লখনউ টুপি, শুঁড় বাঁকানো নাগরা, মুখে পান, বেনারসি জর্দা। বেপরোয়া ভঙ্গি। বেনারসির কারবারি। দোকানে দোকানে রংবাহারি কাপড়ের চেকনাই। জড়োয়ার গয়না রাতের আলোয় চিলের

চোখের মতো ঝিলিক মারছে। সকাল থেকে মধ্যরাত টানা একটা উৎসব। এই শহর!

পানের দোকানের মালিককে 'প্রিন্‌সের' মতো দেখতে। বয়েস একটু বেড়েছে। কিঞ্চিৎ মেদ লেগেছে শরীরে। এতদিন পরেও আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছেন। ঝটপট তৈরি হয়ে গেল দুখিলি পান। কত কি যে তার মধ্যে ঢুকল। প্যাকেট হল। আমাকে দিতে দিতে বললেন, 'সব ঠিক আছে তো! অনেক দিন পরে এলেন। একটা পান স্পেশ্যাল, বেগম পসন্দ, আমার দিদির জন্যে।'

সে যেখানেই যেত জয় করে নিত। অদ্ভুত একটা আলগা সৌন্দর্য ছিল তার। হাত দিয়ে কপালের চুল সরাচ্ছে, এই সামান্য ব্যাপারটাও অসামান্য মনে হত। যখন পেছন ফিরে চলে যেত মনে হত একটা পদ্ম ভেসে ভেসে চলে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে একটা আলো ঘুরত। 'আরোরা'।

প্রকৃতি যেন কুম্ভক করে আছে। এতটুকু বাতাস নেই। এত রাত হল পাথরের দেয়াল এখনো তেতে আছে। ঘাটে ঘাটে মানুষ উপচে পড়ছে। শিবক্ষেত্রে কত মানুষ আসে একটু শান্তির জন্যে। জীবন এক নখঅলা বাঘিনি। মেরে ফেলে না, আঁচড়ায়। ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তবু ভালো লাগে বাঁচতে। ভাল লাগে একসঙ্গে কষ্ট পেতে। ঝড়ের রাতে জানলা- দরজা- খড়খড়ি কাঁপছে। বিদ্যুৎ ফেঁড়ে ফেলছে কাচের শার্সি। উদভ্রান্ত আলোর নীল পটে মাথা মুড়ানো বিপন্ন গাছ। বাজপড়ার শব্দ। দুজনে দুজনকে জাপটে ধরে আছি। যেন দুই কিশোর-কিশোরী। এতবড় একটা পৃথিবী। কোটি মানুষের সংগ্রাম কাহিনি। তারই মাঝে আস্থার বৃত্তে দুটি প্রাণ। ভয় কত ভয় দেখাবে। দুটো হৃদয় যখন একসঙ্গে জীবনের মন্ত্র জপ করে মৃত্যু তখন অসংলগ্ন এক শিকারি। তির আছে লক্ষ্য নেই।

হাঁটছি আর ভাবছি। আনাড়ি পাখির তৈরি বাসা ঝুলে পড়েছে। পাশ দিয়ে কে চলে গেল হেনার গন্ধ ছড়িয়ে। 'বেঁচে থাকা' একটা নেশা, 'মৃত্যু' একটা 'হ্যাংওভার'। হাঁটতে-হাঁটতে, চলতে-চলতে মানুষ একদিন একা হয়ে যায়! প্রতিটি পরিবারের সভ্যরা একটা 'ট্র্যাকে' ছুটছে। দৌড়। কেউ আগে

ফিতেতে বুক ঠেকাবে। কেউ পরে। ঘাড় ঘোরালে দেখা যাবে, আসছে, সবাই আসছে। একে, একে। কেউ আগে, কেউ পরে। টেবিল থেকে দমকা বাতাসে উড়ে যাওয়া কবিতার পাতার মতো এক একটি জীবন।

হেসেছি, কেঁদেছি
পেয়েছি, পাইনি
জিতেছি, হেরেছি
বলেছি, শুনেছি
অবশেষে বৃত্তের বাইরে॥

ঘাসের সবুজে ফুটে থাক নাকছাবি ফুল। ফড়িং এই স্থির, এই অস্থির। সমুদ্রের ঢেউ বিশ্রাম জানে না। আকাশের গায়ে পাহাড়, চিরকাল আটকেই থাকে। কে তাকে দিয়ে গেছে, 'না-চলার' অভিশাপ।

পাতলা, পাতলা আলো আর অন্ধকার দিয়ে বোনা শূন্যতার বেনারসির স্পর্শ নিতে নিতে চলেছি। সেই হাতটা খুঁজছি। ধরব একবার। দোলাতে দোলাতে, কত সুখের গল্প অকারণে বলতে-বলতে, চলতে-চলতে কোনো এক জায়গায় থামব। ফিরে তাকিয়ে ভয় পেয়ে যাব—ফেলে আসা পথটা নেই। চললে আছে না চললে নেই।

বাতাসে খানিক হাতড়ে হাত বুঝতে পারে আর একটা হাত নেই। দীপ নিভে গেলে শিখা কোথায় যায়? দরজা বন্ধ হল কোনটা বাইরে, কোনটা ভেতর! একজন চলে গেলে কেমন করে বলি—কে আছে কে নেই! 'আছি' শব্দটা থাকার 'ভ্রান্তি'।

কেদারঘাটে এসে গেছি। প্রাসাদের মতো অন্ধকারে এই যে বাড়িটা? কার? ওইটাই কি রানি ভবানীর বাড়ি! কতদিনের এই ঘাট! প্রশস্ত, নিখুঁত নির্মাণ। অনেকটা নীচে বারাণসীর গঙ্গা স্তোত্রপাঠ করতে করতে উত্তর বাহিনী।

রাতেরও ছায়া আছে। রানায় বসলাম। অন্ধকার ঘন। একমাত্র আমিই জানি, 'আমি আছি'। সহসা কেউ দেখতে পাবে না। হঠাৎ এলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে জানবে—কেউ রয়েছে।

প্যাকেট খুলে একটা পান মুখে দিলাম। কোনটা? আমারটা না তারটা! আসগর আলির জর্দার সুগন্ধ বাতাসে ছড়াল। দ্বিতীয় পানের খিলিটা পাশে বসে থাকা 'না থাকাকে' বললুম, 'নাও, তোমার স্পেশ্যাল পান।'

পানটা কেউ নিয়ে নিল। আঙুলের স্পর্শ। কেউ একজন। আমার ডান পাশে।

চার

তিন পাশে পাহাড়। নীল পাহাড়। মাঝখানে সবুজ উপত্যকা। গোটা কতক বাংলো এধারে-ওধারে। সামনের পাহাড়টার ও-পিঠে দার্জিলিং। পাহাড়ের কোলে অনেক কমলালেবুর গাছ। বাংলোর লনে গোল করে গার্ডেন-চেয়ার সাজানো। মাঝখানে পাথরের সেন্টার টেবিল। লনটা বড় বড় দেবদারু দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে ধুপি ঝাউ।

এদিকের আকাশ খুব নির্জন। মাঝে মাঝেই কুয়াশা নেমে আসে। পরক্ষণেই রোদের কাছে পরাস্ত হয়ে কান্না রেখে যায়। দেবদারুর পাতায় পাতায়। টিস টিস করে জলের ফোঁটা ঝরে। লম্বা লেজঅলা সুন্দরী পাখি গাছের উঁচু ডালে ঝুলতে ঝুলতে, দোল খেতে খেতে জজ সাহেবের মতো রায় দেয়—ঠিক, ঠিক, ঠিক। আকাশের আইনে বেঠিক কিছু নেই।

সমতলের ফুলেরা এখানে, এই শিশিরের আলিঙ্গনে অন্তর দিয়ে ফোটে। গন্ধরাজ এখানে প্রকৃতই রাজা। বাংলোর গড়ানে চালে থোকা থোকা বেগোনিয়ার কি বাহার! বড় বড় প্রজাপতির কি ভয়ঙ্কর অহঙ্কার!

এখানে সে আসে। আমি জানি। বাংলোর পেছন দিকে, যে-দিকে গেলে পাহাড় আরও কাছে। শিলাখণ্ডের উপাদান ভেসে যাওয়া রোদে চিক চিক করে, কথার মতো, দৃষ্টির কৌতুকের মতো। যেখানে গাছের ভাঙা ডাল, রাতের বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পড়ে আছে। যেখানে পিঁপড়ের পিঠে ডানা তৈরি হয়। যেখানে ছোট ছোট শামুক নির্ভয়ে ঘর থেকে বেরোতে পারে, সেখানে ছোট্ট একটা জলাধার নিজেকেই নিজে তৈরি করেছে পাহাড়ের কান্না ধরবে বলে। পাথরও কাঁদে। তির তির করে পাহাড়ের ফাটল

বেয়ে দুধ সাদা জল নেমে আসে ওই কুণ্ডে।

ওই জলেই পা ডুবিয়ে সে বসে থাকে। জল ছিটিয়ে খেলা করে। জল খুব কিন্তু শীতল নয়। সে আসে, চুপি চুপি আসে। রাতের আকাশে তারারা যেমন বেরিয়ে আসে তাঁবুর বনাত তুলে। সারা রাত উৎসব করে, আলোর ঝিকিমিকি নিয়ে খেলা করে, দিন জেগে ওঠার আগেই লুকিয়ে পড়ে আবার। একটা দুটো খুব সাহসী তারা সূর্য দেখার জন্যে গতিপথের দুই সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকে ভোরের বধূর মতো।

জানি সে আসে, তাই আমি আসি। বড় সাদা একটা তোয়ালে থাকে আমার হাত। পলাতক সেই দিনটা ধরা আছে তোয়ালের সাদা ঘাসের মতো জমিতে। সিলভার গ্রে পাথরে সে দাঁড়িয়ে আছে। পা গড়িয়ে নেমে আসছে খনিজ সম্পদে ভরা জলের মুক্ত দানা। পাথরে পায়ের ছাপ। পা দুটো মুছিয়ে দি। পা না থাকলে পৃথিবীর স্পর্শ জীব পেত কী ভাবে! পায়েই তো প্রেম থাকে। এই পা দুটো জল স্পর্শ করবে বলেই তো পাহাড় গলে পড়েছে। তোয়ালেটা প্রেমের সুতো দিয়ে বোনা।

নির্জন দ্বিপ্রহর পাখির ডাক, পাতায় পাতায় ধরা বাতাসের শব্দ শুনতে শুনতে উঠে গেল সন্ধ্যার কোলে। দিন এইবার ঘুমোবে। বাংলোর ঘরে আলো জ্বলেছে। পালিশ করা কাঠের মেঝে। ফুলেরা চেপে রাখা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে। রাত যেন টসটসে নায়িকা। জামদানি শাড়ির আঁচল উড়িয়ে এসেছে।

লনের চেয়ার একটু একটু করে স্পষ্টতা হারাচ্ছে। পাথরের সাদা টেবিলটা যেন কোনো সমাধি। আর বাইরে নয়। হাতি আসতে পারে। সেই জলকুণ্ডটায় রাত ঢুকে গেছে। পাথর টেনে নিয়েছে পদচিহ্ন।

সেই রাতে সে রেঁধেছিল অনেক কিছু। সাহায্যকারী হাসি-খুশি সেই নেপালি মেয়েটি কি যৌবনের পথ পেরিয়ে গেল! ক্ষণে ক্ষণে দুজনের সেই হাসির শব্দে। রান্নার গন্ধ। নানারকম শব্দ! সেই রাত!

নিভাঁজ, নিপাট বিছানা। দুগ্ধ ধবল। একটিমাত্র মাথার বালিশ। পাহাড় গড়িয়ে শীত নামছে। কে আমার শরীরে একটি শাল জড়িয়ে দিল। সেদিনের সেই কিশোরী আজ রমণী। সে আমাকে ভালোবাসত। সেই ভালোবাসার উত্তরাধিকারী হয়েছে এই মেয়েটি!

পাঁচ

সেই কদম ফুলের গাছটা অনেক বড় হয়েছে। আর কয়েকদিন পরেই মাথার ওপরের আকাশে এসে যাবে মৌসুমি মেঘ। ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা বাতাস আসবে সবুজ মাঠ পেরিয়ে। দূরের জঙ্গলে সেই পরিচিত ময়ূরগুলো কর্কশ চিৎকারে ডাকবে উদাসীন প্রেমিকাকে। এ সার বক শ্যামা মেঘের কোল ছুঁয়ে মালার মতো উড়ে যাবে, কালিদাসের কালের কোনো নায়িকার সন্ধানে। কদম্ব গাছ ভরে যাবে ফুলের শিহরনে।

আশ্রমটি ঠিক সেই রকমই আছে। একটু প্রাচীন হয়েছে। অধ্যক্ষার বয়েস বেড়েছে। তরুণী তিনটি গেরুয়া ধারণ করেছেন। চোখে-মুখে সাধনার অশান্তি।

দালানের দেয়ালে সেই আয়নাটা আজও ঝুলছে। সে ঝুলিয়েছিল। সেই ঘর। চৌকি, বিছানা। দালানের একপাশে জলের বালতি মগ। সেই একটা প্রজাপতি। রূপের অহঙ্কারে ছটফট করে উড়ছে। দক্ষিণদিকের জানলা খুললে, সেই পাতাঝরা বাগান। অতীত যেখানে মচমচ করে বেড়ায়। সোনার বালা পরা নিটোল, ফর্সা একটি হাত একটি সাদা গোলাপ সাবধানে তুলে নেয়। দীর্ঘ শরীর। আমলকী রঙের বাঁধন না মানা চুল। ভেসে যাওয়া দুটি চোখ। করুণ কোনো রাগিণীর মতো মুখ। শাড়ির প্যাঁচে মহাকাব্যের ভাষা। আকাশ ঝুঁকে পড়ে পুরাণের এই নায়িকাকে দেখছে। কোনো দুষ্মন্তের হারিয়ে যাওয়া এই শকুন্তলা।

জানলার ধারে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। যে নেই তাকে দেখছি। গোলাপ ফুটে আছে। রুবির আংটি পরা মোম দিয়ে তৈরি সেই ইঙ্গিতের মতো আঙুল দুটো কখন আসবে!

সেবার আমরা অনেক রাতে এসেছিলুম। ঠাকুরঘরের দীপ নিভে গিয়েছিল। ধূপের সুবাস বাইরের দালানে প্যায়চারি করছিল। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে গাছের পাতা দুলিয়ে গিয়েছিল।

আহার কী হবে! মাতাজির প্রবল দুশ্চিন্তা। সব সমস্যার সমাধান করে

দিয়েছিল সে। 'মা আলু আছে?'

আলু ছিল। ভাঁড়ারের মেঝেতে বালির বেলাভূমিতে আলুর ঢেউ। সে চানে গেল। টিনের দরজা লাগানো বাথরুম। কম পাওয়ারের আলো। জলের শব্দ। ঘরের খাটে তার শাড়ি বড় ক্লান্ত। গোটা শাড়িটায় সে লেগে আছে। ইচ্ছে করছিল যে কোনো একটা অংশ বুকের কাছে চেপে ধরি।

না, এ যে আশ্রম! এখানে প্রেম থাকবে, দেহ থাকবে না। সুর থাকবে বাণী থাকবে না। সে ঘরে আসবে তাই আমি বাইরে চলে গিয়েছিলুম। অনেকটা দূরে আলোর রেখা টেনে রেলগাড়ি যাচ্ছে। একটানা একটা শব্দ। আশ্রমের কুকুর গা ঝাড়ছে। অনেক উঁচু একটা গাছের পাতায় তারা আটকে আছে।

অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের গল্প হল। হিমালয়ের গল্প, নর্মদার গল্প। আলুকাবলির স্বাদ জিভে। ছোট ছোট হাই উঠল। কুকুরটা অকারণে ডেকে উঠল। সেই রাত দূরপাল্লার রেলগাড়ি হয়ে গেল। স্টেশানে পড়ে রইল একজন যাত্রী।

মেয়েটি বললে, 'রাতে হঠাৎ যদি কিছু দরকার হয় ডাকবেন। আমি পাশের ঘরেই আছি। আমার নাম রমা।'

সেই আয়নাটার সামনে দাঁড়ালুম। কেউ নেই। রাতের আকাশ একখণ্ড।

ছয়

একতলা বাড়ি। দুখানা ঘর। সামনে বারান্দা। পেছনে আরও চওড়া বারান্দা। সেদিকে অনেকটা খোলা জায়গা। কোমর-উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের ওপারে একটা খাল। বাঁধ থেকে যখন জল ছাড়ে খালটা তখন জলে টইটম্বুর হয়ে যায়। ওই খোলা জমিটা লম্বা লম্বা ঘাসে ভরা। শরতে প্রচুর ঘাসফুল হয়। নানা রঙের নাকছাবির মতো। শরতের নতুন ফড়িং, নতুন প্রজাপতিরা নাচতে আসে।

এপাশে একটা ওপাশে একটা বাঁশ পুঁতে মোটা একটা তারের টানা দেওয়া

হয়েছে, জামা—কাপড় শুকোতে দেওয়ার জন্যে। সাদা শাড়ি, নীল শাড়ি, সবুজ, হলুদ, কমলালেবু। পরিচ্ছন্ন অন্তর্বাস। দুপুরের রোদে রঙের রামধনু। বাতাসে শাড়িরা দেহ ছাড়াই নাচ দেখায়। এক একটা প্রান্ত ঢেউয়ের মতো উড়ে উড়ে কী যেন ছুঁতে চায়। কাকে যেন ধরতে চায়।

খালে মাঝে মধ্যে নৌকো চলে আসে। পালতোলা নৌকোও আসে। কোনোটায় বড় বড় কুমড়ো। কোনোটায় নুনের বস্তা। মসৃণ ভেসে যাওয়া। ওই আকাশেই সূর্য আসে। চাঁদ বেরিয়ে পড়ে রুপোর তবক ছড়াতে ছড়াতে। খালের ওপারে ঝাঁকড়া বটের ডালে বসে পেঁচা প্রহর ঘোষণা করে।

স্নান হয়ে গেছে। দূর থেকেই বুঝতে পারি তার সুগন্ধি শ্বেত-অঙ্গ শীতল। দু'হাত তুলে শাড়ি মেলছে। এই দৃশ্যে পুরুষের মন উতলা হতে পারে। নিরাশ্রয় মন কোনো একটা বিশেষ জায়গায় আশ্রয় পেতে চায়। রুদ্ধশ্বাস হতে চায়। মরে যেতে চায়। সে হঠাৎ তাকিয়ে এই দেখাটা দেখে ফেলতে পারে। তখন যেন বিব্রত বোধ করা। মেয়েদের সবটাই যে দেখার মতো। চোখ ভ্রমরের মতো কখন যে কোথায় গিয়ে আছড়ে পড়বে! স্বীকার করে নেওয়াই ভালো—না তাকিয়ে পারিনি।

শরীরে নীচের দিকটা লম্বা লম্বা ঘাসের আড়ালে হারিয়ে গেছে। হালকা হলুদ শাড়ি তার দেহগঠনটিকে সযত্নে জড়িয়ে ধরে ওপর দিকে উঠে তার সাদা ব্লাউজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। একটু দূরে ঘাসগুলো মাঝে মাঝে খুব দুলে দুলে উঠছে। একটা সাদা বল। বল নয়, তার অতি আদরের সাদা বেড়াল খেলা করছে। একটু পরেই কোলে চড়ে ফিরে আসবে। আদুরে মাথাটা বুকের নরমে, মৃদু গরমে চেপে ধরা। হাতের পাশ দিয়ে ঝুলে থাকবে তার মোটা সাদা ন্যাজের অহংকার।

এরপর বারান্দার এই জায়গাটায় এসে সে দাঁড়াবে। লম্বা চুলের স্তরে স্তরে প্রবাহিত হবে লম্বা সাদা চিরুনি; ঝাউগাছে লেগে থাকা বাতাসের শব্দে। আকাশে যেমন চাঁদ ওঠে, ঠিক সেই রকম কপালের মাঝখানে জেগে উঠবে গাঢ় নীল একটি টিপ। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাবে। কিছু না বললেও অনেক কিছু বলা হয়ে যাবে।

এই সময় সেই বালিকাটি আসবে, যার নাম দুলারি। সে নিজের সঙ্গে গল্প করে। নিজেকেই নিজে বকে। কখনো শাস্তি কখনো পুরস্কার ঘোষণা করে। কখনো বলে, মেলা বসলে কাচের চুড়ি কিনে দেব। কখনো বলে, তোর মতো পাজি মেয়েকে কিচ্ছু দেব না। তারপরেই জিজ্ঞেস করবে —কী হল, রাগ হল! মাঝে মাঝে নিজেকেই নিজে বকে—কী হল! খুব যে বসে আছিস, কোনো কাজ নেই। দুলারি একটা নয় দুটো।

ঘাসগুলো অনেক বড় হয়েছে। তারটায় মরচে ধরে গেছে। রান্নাঘরের পাশের চৌবাচ্চাটা শুকনো কাঠ। তারে রং-বেরঙের যেসব শাড়ি 'কনসার্টের' মতো ঢেউ তুলত, আকাশে উঠে গেছে। কোনো দিন দুপুরে বৃষ্টির পর রোদ উঠলে দেখা দেবে রামধনু হয়ে।

বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল। হামিদ চাচার কাছে। বাজারে তার জমজমাট ব্যবসা। বিরাট জামাকাপড়ের দোকান। ছোট্ট একটা দরজির দোকান থেকে এত সব হল। কারও ভরে, কারও ঝরে। দুলারি বড় হয়েছে। মেয়ে হয়ে গেছে। এরপর কোনো একদিন মা হবে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। শরীরে যৌবনের প্যাঁচ। পুরুষের চোখে না পড়ে উপায় নেই। এখনো সে নিজের সঙ্গে কথা বলে। দুলারির মা অনেকদিন হল কোথায় চলে গেছে। দুলারির বাবার হাঁপানি ছিল। পৃথিবীতে এত বাতাস; কিন্তু তার ফুসফুসে ঢুকতে চাইল না। কেউ কিছু করার আগেই মানুষটার বাঁচা ফুরিয়ে গেল। হামিদ চাচার দরজির দোকানে কাজ করত। সেই সেলাই মেশিনে আর একজন এসে বসল। কল চলবেই।

দুলারি একটা প্যাকেট আবিষ্কার করেছে। খুলতেই বেরিয়ে পড়ল সুন্দর এক জোড়া স্লিপার। জুতো আছে পা নেই। দুলারির পা বেড়েছে। ওর পায়ে হতে পারে। পরবে না, কিছুতেই পরবে না। বুকের কাছে ধরে রাখবে।

দু'চোখে টলটলে জল—'তুমি আমাকে ফেলে চলে যাবে? কার কাছে থাকব আমি?' নানা রকমের পুঁটলি-পোঁটলা সামনে। আমার হাতে সেই সাদা চিরুনি। এ পাশে আমি, ওপাশে দুলারি। সেই সাদা বেড়ালটা এক পাশে। তারে একটা ময়না এসে বসেছে।

দুলারি জলভরা চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমরা বসে থাকলেও সময় চলে যাবে। খালে কালও এত জল ছিল না। আজ একেবারে টইটম্বুর। বর্ষা এল।

আমার চোখে দুলারির চোখ দুটো আকাশের মতো আটকে আছে। একটি নারীর মনে আমি কি আবার, আর একবার আটকে গেলাম।

ভাগ্য

ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন দৌড়াচ্ছে। গাছপালা, ঘরবাড়ি সমান গতিতে পেছন দিকে পালাচ্ছে। ছোট্ট মতো একটা পাহাড় সমানে পাশে পাশে চলেছে। ইশারায় ডাকছে—চলে আয়, চলে আয়। কেউ কোথাও নেই। বাঁশঝাড়, বেতঝাড়। বহু রকমের জংলা গাছ। পাতার গন্ধ, কচি বাঁশের গন্ধ। বড় ছোট পাথরের অলস গড়াগড়ি। সাপের মসৃণ পথ চলা। কোনো পাখির আচমকা ডাক। ছোট্ট ঝরনায় বর্ষার চোখের জল। আমাদের জগৎ কত সুন্দর পায়ে পায়ে চলে এসে দেখে যাও না। এস না, গল্প করি। শীত শীত বাতাস পাবে। বড় বড় প্রজাপতি তোমাকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। ছায়া সরে গিয়ে রোদ আসবে, রোদ সরে গিয়ে ছায়া।

পাহাড়টা হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে গিয়ে হঠাৎ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেকটা জায়গা পেলে গাছ-পালা, পাহাড়, নদী, সব যেন বালিকার মতো চপল হয়ে ওঠে। আমার পাশে শরীরটাকে একেবারে এলিয়ে দিয়ে বসে আছে আরতি। এই এক বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। ছোট্ট মতো একটা সংসার। ঘটি, বাটি, থালা, কাঁসি। আমরা বারে বারে চা খাই, আর খালি গল্প করি। হ্যা, হ্যা করে হাসি। একদিনও ঝগড়া হয়নি, কারণ, দুজনেই দুজনের কথা খুব শুনি। খুব কোনো অ্যাম্বিশন নেই। যা রোজগার করি দু'বেলা ভাত, ডাল, রুটি তরকারি হয়ে যায়। আজে বাজে খাওয়ার অভ্যাস নেই। এটা, ওটা, সেটা কেনার ঝোঁক নেই। বোঝা বাড়িয়ে লাভ কী?

আরতির চেহারাটা এমন, ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। বড়সড় একটা বারবি ডল। হালকা হলুদ রং পছন্দ করে। মাথায় প্রচুর চুল। টানা টানা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। হাতের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা, ঢেঁড়সের মতো। মসৃণ। হিউমার বোঝে। মজা করতে জানে। ছেলেমানুষের মতো মন। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে আমরা লুকোচুরি খেলি। ছেলেবেলা ফিরে আসে। ছেলেবেলার যত দুষ্টুমি। কাতুকুতু দেওয়া। বিছানায় শুয়ে প্রথমে এক রাউণ্ড ধস্তাধস্তি কুস্তি। চাদর-ফাদর কুঁচকে, বালিশ-টালিশ ছিটকে, চুল- এলোমেলো জটে-বুড়ি

হয়ে, সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। আরতির দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় শব্দ, ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস, হুঁ হুঁ শব্দ। কখনো সে আমার ওপরে, কখনো আমি তার ওপরে। মা থাকলে ছুটে এসে পিঠে গুম গুম কিল বসিয়ে দিতেন। কিন্তু, আমরা দুজনেই অনাথ। 'কি কেমন সব আছ'—বলে সামনে এসে কেউ দাঁড়াবে না। দুজনে দুজনের কাঁধে হাত রেখে একটা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছি। নদীটার নাম জীবন নদী। একদিন না একদিন সেই নৌকোটা আসবেই আসবে। আমাদের মধ্যে একজন উঠে যাবে। এ নৌকোয় একজনই উঠতে পারে। সঙ্গে পোঁটলা-পুঁটলি কিছুই থাকবে না। একজন যাবে আর একজন পাড়ে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়বে—আর কোনোদিন, কোনো জীবনে দেখা হবে না।

আরতির মাথা আমার ডান কাঁধে। পেল্লায় খোঁপা আমার পিঠে দুলছে। চোখ জানলার বাইরে। এক সার বক উড়ে যাচ্ছে। গুনগুন করে গান গাইছে। হঠাৎ গান থামিয়ে বললে—'লজেন্স খেতে ইচ্ছে করছে।'

'লজেন্স কোথায় পাব?'

'বেড়াতে বেরিয়েছ পকেটে লজেন্স রাখনি!'

অবিরাম গতিতে ট্রেন ছুটছে, একগুঁয়ে একটা গণ্ডারের মতো। সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। বাইরেটা ক্রমশই মনমরা হয়ে উঠছে। দিন মরতে বসেছে, তাই বুঝি প্রকৃতিতে শোকসভা। সামনে পড়ে আছে বারো ঘন্টার আঁধার পথ। একজোড়া লোহার লাইন। খাঁচার পর খাঁচা লোহার খাঁচা। একটা শক্তিমান ইঞ্জিন। সার্চলাইটের আলো সামনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। হরেক আকার, হরেক স্বভাবের মানুষ। কেউ বসে, কেউ কাত হয়ে। সবাই চলেছে। সকলের ওই একটাই কাজ চলা। ইঞ্জিন মাঝে মাঝে শাঁখ বাজাচ্ছে। উল্টোদিক থেকে আসা কোনো ট্রেন আমাদের পাশ দিয়ে তীব্র গতিতে চলে যাচ্ছে। তখন শরীরে কি রকম একটা ধাক্কা লাগছে।

আরতি ছোট্ট একটা হাই তুলল। ছোট্ট, মিষ্টি হাই। তারপরে বললে, 'ধুস্, গরম সিঙাড়া খেতে ইচ্ছে করছে। এমন একটা ট্রেনে চাপলে কিছুই পাওয়া যায় না।'

'চলন্ত ট্রেনে গরম সিঙাড়া পৃথিবীর কোনো দেশে পাওয়া যায় না।'

'বড় বড় স্টেশানে পাওয়া যায়।'

'সে খেলে আর দেখতে হবে না।'

'কিছু তো একটা খেতে হবে। না খেয়ে কতক্ষণ থাকা যায় ভাই?'

আমাদের সামনের সিটে সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর গোঁফজোড়া দেখার মতো। ইংরিজিতে এই ধরনের গোঁফকেই বলে—হ্যান্ডলবার মুশট্যাশ। ভদ্রলোক কী একটা বই পড়ছেন। পড়ছেন তো পড়ছেন। পড়েই চলেছেন। ট্রেনে যাঁরা বাইরের দৃশ্য না দেখে বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকেন, তাঁরা সব দায়িত্বজ্ঞানহীন ভ্রমণকারী। আর একটু পরেই নির্ভেজাল অন্ধকারে দৃশ্যপট ডুবে যাবে, তখন পড়ুন না। ঘোঁত ঘোঁত করে পড়ুন।

আরতি সোজা হয়ে বসল। বসেই বললে, 'একটা রবীন্দ্রসংগীত কর।'

'আমি গান জানি?'

'জানি না বললে তো হবে না। চেষ্টা কর।'

'রবীন্দ্রনাথ রাগ করবেন।'

'রাগ করবেন কেন?'

'ঠিক হবে না বলে।

আরতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সামনের আসনে বই মুখে বসে থাকা ভদ্রলোককে বললে, 'আপনার গোঁফটা ভারি সুইট!'

কী কাণ্ড! ভয়ে সিঁটিয়ে গেছি। ভদ্রলোক কী না কী বলবেন? 'কাকে কী বলছ?'

আরতির চোখ দুটো জলে টস টস করছে। ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। এমন অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে আগে কখনো হয়নি বোধ হয়। মেয়ের বয়সি একটি মেয়ে ফাজিলের মতো বলছে—আপনার গোঁফটা ভারি সুইট। তারপরেই দু'চোখে জল।

জিজ্ঞেস করলুম, 'কাঁদছ কেন?'

'হঠাৎ বাবার মুখটা ভেসে উঠল।'

আরতি চোখ মুছতে মুছতে বললে। ভদ্রলোক শুনলেন। মুখে একটা রাগ রাগ ভাব ফুটে উঠেছিল। মিলিয়ে গেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন আরতির মুখের দিকে। বই মুড়ে ফেলেছেন।

পরিস্থিতিটা সহজ করার জন্যে আরতি বললে, 'আপনার মুখের সঙ্গে, চেহারার সঙ্গে আমার বাবার অদ্ভুত মিল। আমার বয়েস যখন সাত কি আট, বাবা আর মা দুজনেই এক সঙ্গে মারা গেলেন।

মারা যেতে তো কোনো কষ্ট নেই। পড়লুম আর মরলুম। চোখের সামনে।

তলিয়ে গেলেন দিঘির জলে। বর্ষার ভরা দিঘি। বেশি সাহস তো! মেয়েটা পড়ে রইল। সবাই বললে, ভাবিস না আরতি, আমরা তো আছি! সে যা থাকা।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার বাবার নাম?'

'ব্রজেন্দ্রনাথ রায়।'

'অধ্যাপক ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তাঁর ছাত্র। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক অধ্যাপক। এই গোঁফ তাঁরই ইনস্পিরেশন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর লেকচার শুনতুম। তাঁর মরে যাওয়াটা ঠিক হয়নি।'

'এখন আর বললে কী হবে? এই ছেলেটা না থাকলে আমি কী করতুম?'

জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার নাম?'

'আমার নাম দেবব্রত। আমি এখন আমেরিকাবাসী। মাঝে মাঝে দেশে আসি। তোমাদের দুজনের কথা খুব শুনতে ইচ্ছে করছে। যদি আপত্তি না থাকে।'

আরতি বলল, 'আপত্তি কেন থাকবে স্যার। গড় গড় করে এখনি সব বলে যেতে পারি, বড়, ছোট নানা শয়তানের নানা গল্প।'

'তার আগে প্যাটিস খাবে? হট বক্সে আছে। সিঙাড়ার অলটারনেটিভ।'

'অবশ্যই খাব। অনেকক্ষণ ধরে ভেতরটা খাই খাই করছে।'

লিমিটেড স্টপ ট্রেন। তীব্র বেগে ছুটছে। চারপাশ থেকে অন্ধকার মুড়ে আসছে। কামরায় কামরায় ঘুম হাই তুলছে। আরতি তার জীবনের গল্প বলছে। একটা মামা আর দ্বিতীয় পক্ষের এক ভয়ঙ্করী। তিনি আবার অভিনেত্রী। প্রথম পক্ষের একটা ড্রাগ অ্যাডিক্ট মামাতো ভাই।

না, এ গল্প বলা যাবে না। বলা উচিত নয়। ঘৃণার গল্প, নিষ্ঠুরতার গল্প, ব্যর্থতার গল্প। মানুষের নষ্ট হয়ে যাওয়ার গল্প। আরতির বাঁ হাতের কবজির কাছটা চেপে ধরলুম। মনে পড়ল, প্রথম যেদিন ধরেছিলুম, সেদিনের কথা। মানুষের কবজিতে ভগবান থাকেন। নাড়িতে জীবনের স্পন্দন। টিক্‌টিক্ ঘড়ি।

আরতি মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

'প্লিজ! অতীতের কথা আর বোলো না।'

দেবব্রতবাবু বললেন, 'দ্যাটস রাইট। বেরি দি পাস্ট। নদীতে জল দুবার ফিরে আসে না। প্যাটিসটা কেমন?'

'খুব সুন্দর।'

'একই প্যাটিস দু'বার খাওয়া যায় না।'

'যায় না।'

একই জীবন দু'বার পাওয়া যায় না।'

'যায় না।'

'একই তির দুবার ছোঁড়া যায় না।'

'অবশ্যই না।'

'একটা টাকা সমুদ্রে তলিয়ে গেলে তুলে আনা অসম্ভব।'

'অবশ্যই।'

'অতীত ফিরে আসে না।'

'দাগ রেখে যায়।'

'তার ওপর অনেক নতুন দাগ পড়ে। শেষ দাগ হল মৃত্যু। স্লেট মুছে যায়। তোমার নাম?'

'মৃণাল।'

'ওর নাম?'

'আরতি।'

'আর কিছু জানতে চাই না।'

নীল নীল নাইট ল্যাম্প সব জ্বলে উঠল। ট্রেন জুড়ে শুয়ে পড়ার আয়োজন। বাইরে চাঁদের আলো এলোচুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলোকিত নির্জন ছোট ছোট শহর পেছন দিকে নিমেষে ছুটে পালাচ্ছে। আমার 'আপার বাঙ্ক'। মাথাটা নীচের দিকে ঝোলালে আরতিকে দেখতে পাচ্ছি। তাকিয়ে আছে। কিছু একটা ভাবছে। কেবলই প্রশ্ন আসে মনে, আমি কি আরতিকে সুখী করতে পেরেছি। ড্রাগ অ্যাডিক্ট সেই মামাতো ভাইটা যদি হঠাৎ মরে না যেত তাহলে আরতি পাচার হয়ে যেত নিষিদ্ধ পল্লীতে। সেই রাতটা কেমন

করে ভুলব। আমাদের পাড়ার 'জিমনাসিয়ামে' আলুথালু পোশাকে ঝড়ের পাখির মতো একটা মেয়ে এসে ঢুকল। ট্রেড মিলের আড়ালে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ব্লাউজের পিঠের দিকটা ফালাফালা।

পেছন পেছন এসে ঢুকল গুণ্ডা মতো চেহারার দুটো লোক। খুনিদের মুখ দেখলেই চেনা যায়। পল্টুদা বারবেল ভাঁজছিলেন। ছ'ফুট। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি। পুলিশের সার্জেন্ট। রয়্যাল এনফিল্ড মোটর বাইকে ঘোরাফেরা করেন।

আরতির ভাগ্য আরতিকে ঠিক জায়গায় এনেছিল। গুণ্ডা দুটো না বুঝেই বেঠিক জায়গায় এসে পড়েছিল। দুটোর তাল তুবড়ে দিতে পল্টুদার মিনিট দশেক সময় লাগল। দুটোই কালীঘাট অঞ্চলের মাস্তান। সোজা চালান। পল্টুদা বললেন, দুটোরই চোখ থেঁতলে দিয়েছি। পৃথিবীর আলোর দিকটা যখন দেখতে শেখেনি অন্ধকারে হাতড়ে মরুক।

দেবব্রত এরই মধ্যে আমাদের দেবুদা। গোঁফের আড়ালে ভারি নরম মনের একজন মানুষ। বিপরীত দিকের বাঙ্ক থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা ঘুমোলে নাকি?'

'না দেবুদা। পিঠের তলা দিয়ে কেমন রেললাইন চলে চলে যাচ্ছে অনুভব করছি।'

'ট্রেনে আমার ঘুম আসে না। আমি এমনিতেই খুব কম ঘুমোই। সাইকোলজিক্যাল কারণ। ঘুম এলেই ভয়ঙ্কর রকমের একটা চিৎকার শুনতে পাই। যেন কেউ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। পূর্ব জীবনের কোনো ঘটনা হয়তো! এ-জীবনে ফিরে ফিরে আসে। ঘুমোতে দেয় না।'

কোনো একটা স্টেশানে ট্রেন থামবে। স্পিড কমছে। 'চা খাবে নাকি?' দেবুদা উঠে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরতি ঢেঁকির মতো লাফিয়ে উঠল, 'পাওয়া যাবে দেবুদা?'

'মনে হচ্ছে যাবে।'

প্ল্যাটফর্মের দিকের জানলাটা নামাতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস, স্টেশন স্টেশন গন্ধ। রাত দুটো। চারপাশ কেমন যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। প্ল্যাটফর্মের অতি ব্যস্ত মানুষগুলোকে মনে হচ্ছে 'মথ'। ফড়ফড় করে উড়ছে। আরতি

সারা দিনে দশ-বারো কাপ চা অক্লেশে খেয়ে ফেলতে পারে। যাদের মন ভালো, তারা বারে বারে চা খায়। আর রাঁধতে দিলে সুন্দর রান্না করে। আরতির দুটো গুণই আছে। ওর জন্যে আমাকে অনেক অনেক দিন বাঁচতে হবে। সাজিয়ে গুজিয়ে রাখতে হবে।

বাঙ্কের ওপর থেকে থুপুস করে নীচে নেমেই মনে হল, এই রাতটা আর ফিরবে না।

দুজন লোক স্ট্রেচারে কাকে শুইয়ে তরতর করে এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল। সাদা কাপড় ঢাকা। কানে এল, 'মর গিয়া, মর গিয়া।' এরই মধ্যে মোটা খড়খড়ে ভাঁড়ে আমাদের চা পান হল। একজন হেঁকে গেল, 'বয়েলড এগ'। পাশের কম্পার্টমেন্টে সেনাবাহিনীর লোকজন উঠছেন। রাইফেলধারী চারজন রেলরক্ষী এদিকে ওদিকে ঘুরছেন। অল্পবয়সি এক বধূ এক ভদ্রলোকের বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। অল্প দূরে উদাস এক ভদ্রলোক সিগারেটে লম্বা লম্বা টান মারছেন। প্ল্যাটফর্মের বাইরে রেলের বাড়িটাড়ি পেরিয়ে পড়ে আছে ফাঁকা একটা মাঠ। দুপাশে দুটো গোলপোস্ট। মাঠের শেষে বড় একটা বাড়ি। মনে হয় স্কুল।

ট্রেন ছেড়ে দিল। মসৃণ গতি। একটু পরেই প্ল্যাটফর্মের ব্যস্ততা থিতিয়ে যাবে। আবার পরের ট্রেনের অপেক্ষা। ওপরের বাঙ্কে চিৎপাত। আরতি শুতে শুতে বললে, 'দেবুদা! আগের জন্মে আপনি বোধহয় মহাদেব ছিলেন!'

'হতে পারে; তাই এ-জন্মে এত গরল ধারণ করতে হচ্ছে!'

'আমেরিকায় আপনি কী করেন দেবুদা?'

'বিষ নিয়ে গবেষণা।'

'এত জিনিস থাকতে বিষ!'

'বিষাক্ত এই পৃথিবী। সর্বত্র গরল। গরল তরল হলেই অমৃত। জীবনানন্দ আমার প্রিয় কবি। শুনবে কটা লাইন?'

'নিশ্চয়ই।'

'হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো;
চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—দেবদারু ছায়া ইতস্তত

বিচূর্ণ থামের মতো; দ্বারকার;—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের —ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
'মনে আছে?' সুধালে সে—সুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন?'

কবিতা শেষ হতেই আরতি বললে, 'এ বাবা! আমেরিকায় থাকলে কি হবে! আপনার মনেও দুঃখ! বনলতা কি পেয়েছেন?'

'বনে অনেক লতা! টেনে টেনে বিষ বের করি। অ্যালকালয়েড। সেই বিষ আজও পেলুম না যাতে মানুষের মনের পোকা মরে।'

থাকতে না পেরে আমি বলে উঠলুম, 'পৃথিবীটা গরল আর গাড়লের।'

আরতি জিজ্ঞেস করলে, 'গাড়ল মানে কী?'

'গাড়ল মানে ভেড়া।'

আপার বাঙ্কের সুবিধে, বেশ নির্জন। ঘুম না এলেও ভাবনা আসে। মুখের একটু উঁচুতেই কামরার চাল। সেই রাতে গুটি গুটি ফিরে এল। চোখের সামনে বিশালদেহী পল্টুদা। আরতি যেন তাড়া খাওয়া পায়রা। পল্টুদা বললেন, 'চল, তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসি।'

'ও বাড়িতে আমি আর যাব না।'

'তাহলে কোথায় যাবে?'

'আমি তো জানি না।'

পল্টুদা আমার কাঁধে হাত রেখে কানে কানে বললেন, 'কী হবে রে মৃণাল! এ যে ডেঞ্জারাস সুন্দরী! তোর বাড়িতে আশ্রয় দিবি?'

'না ভেবেই বললেন যা হোক। তারপর কাল সকালে এসে আপনারাই আমাকে হাজতে পাঠাবেন! আপনার বাড়িতে রাখুন না।'

'আমার বাড়ি কোথায়? আমি তো ব্যারাকে থাকি।'

তখন আমরা সবাই ভাবতে বসলুম। তেলের মতো রাত গড়িয়ে চলেছে। স্টিল প্লেটের মতো কালো আকাশ। রাতের মতো কোথায় একটা আশ্রয় দেওয়া যায় বিপন্ন, বিপদগ্রস্ত এই মেয়েটাকে।

আরতি বললে, 'আপনারা কি আমাকে ঘেন্না করছেন?'

পল্টুদা প্রতিবাদ করলেন, 'এ কি বলছ তুমি? চল, তোমাকে অ্যালিস ইন দি ওয়ান্ডারল্যান্ডে রেখে আসি।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি রে!'

তিনি একজন অসাধারণ ঠাকুমা। মানুষের চুল পাকলে সাদা হয়। ঠাকুমার চুল সোনালি। পাকা পেয়ারার মতো গায়ের রং। মা দুর্গার মতো মুখ। বড় বড় দুটো চোখে জ্বলছে কালো আলো। সব সময় পরে থাকেন 'গঙ্গাজল' রঙের পাতলা সিল্কের শাড়ি। দেখা হলেই বলেন, 'কী রে?' এই একটা প্রশ্নেই বেরিয়ে আসে তাঁর মনের আন্তরিকতা। বিরাট পাঁচিল ঘেরা একটা জায়গায় টোপরের মতো চারটে ছোট ছোট বাড়ি। অদ্ভুত আর্কিটেকচার। একটাতে মন্দির। একটাতে থাকা। আর দুটোতে ছোটদের স্কুল। সারা বাগান ফুলে ফুলে ভরা। অ্যালিস ঠাকুমার 'ওয়ান্ডারল্যান্ড।'

আমি তখন আমার এক বন্ধুর পোড়ো বাড়ির নীচের তলায় ভূতের মতো থাকি। দোতলায় এক অদ্ভুত বৃদ্ধ থাকেন। সারারাত ছড়ি ঠক্‌ঠক্ করে ঘরময় ঘুরে বেড়ান। মনে হয় মাথায় কোনো গোলমাল। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, সারারাত কী করেন? উত্তর হল, 'দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।' মাঝে মাঝে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়েন, 'আমার নায়েব কোথায় গেল? নায়েব?'

সেই রাতে ঠাকুমা আমাদের যা বললেন, খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা। 'শোন, এই মেয়েকে এ পাড়ায় রাখা যাবে না। থানা-পুলিশ করেও লাভ হবে না। কাল কাকভোরে দুজনে পালা।'

'কোথায় পালাব ঠাকুমা? আর এই বা আমার সঙ্গে পালাতে চাইবে কেন?'

ঠাকুমার সেই বিখ্যাত হাসি। হাসতে হাসতে বললেন, 'পালাতে চাইবে কেন! এ যে তোর বউ রে হতভাগা। চিনতে পারছিস না। আকাশ থেকে শিল পড়ে, তোর ঘাড়ে বউ পড়েছে। আয় চার হাতের মিলন করে দি।'

'আইন?'

'আইন কী করবে? মিঞা বিবি রাজি তো কেয়া করে কাজি।'

রাত এদিকে ভোর হয়ে আসছে, অথচ আমার রাতের গল্প শেষ হচ্ছে না। কোনো একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রেনটা যাচ্ছে। লোহা লক্কড়ের ভয়ঙ্কর ঐকতান। আধো নিদ্রা, আধো জাগরণ। পল্টুদা বলছেন, 'আমাকে যেতেই হচ্ছে, ডিউটি!' চলে গেলেন। ঠাকুমা কেমন একটা মুখ করে বললেন, 'একটা রাত থাকতে হয় থাক।'

আরতি এতক্ষণ বসেছিল চুপ করে। হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে উঠে, আমার ডান

হাতটা শক্ত করে ধরে একটা ঝটকা মেরে বললে, ‘এই ওঠ তো! চল।’

সেই ধরা। কব্জির কাছে রক্ত জমে গিয়েছিল। আজও ধরে আছে। এতটুকু শিথিল হয়নি। পাকা ভাস্করের মতো ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে আমাকে একটা নতুন মানুষ করে দিলে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করতুম, ‘তুমি কি আমায় সত্যিই ভালোবাস?’

জবাব আসত, ‘কবে থেকে এমন ন্যাকা হলে।’

সেই রাতেই আমরা পাড়া ছাড়লুম। পাড়ার কুকুরগুলো যেন পাহারা দিয়ে নিয়ে এল। সেই পোড়ো বাড়ির নীচের তলায় রাত কাটল বাঁধা-ছাঁদা করে। আমার পকেটে তখন সরকারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটার। পরীক্ষা দিয়েছিলুম। ফরেস্ট রেঞ্জারের চাকরি। উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে পোস্টিং। কার ভাগ্য! আমার না আরতির। সাজানো, কাঠের বাংলো। দোতলার বারান্দায় পাশাপাশি বসে থাকি। পরিষ্কার দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা এত কাছে চলে আসে, যেন হাত বাড়ালেই স্পর্শ করা যায়।

কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল বলে জেগে উঠলুম। আরতি আমার নাক টিপে ধরেছিল। বললে, ‘ওঠ! প্রায় এসে গেছি।’

দেবুদা বললেন, ‘তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ট্রেনের শেষ এইখানেই। খালি হলে নামা যাবে। সব গুছিয়ে নাও।’

সবাই প্রায় নেমে গেছেন। আমরা এগোচ্ছি। আরতি সবার আগে। তারপরে দেবুদা আর আমি। একটা ‘কূপে’র সামনে আরতি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ নেই। সামনেই, নীচের আসনের কোণের দিকে তোয়ালে জড়ানো ফুটফুটে একটি বাচ্চা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কেউ নেই। ট্রেন একেবারে খালি। মুখটা পদ্মফুলের মতো ভোরের আলোয় ফুটে আছে।

সেই সে প্রথম রাতের আরতি। হাতের ব্যাগটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছোঁ-মেরে বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে। স্বপ্ন দেখছে। বাচ্চাটাকে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে নিয়ে বললে, ‘চলুন, চলুন! আমি মাঝখানে থাকি।’

কোনো দাবিদার নেই। নির্বিঘ্নে স্টেশনের বাইরে। সুন্দর সাদা একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। 'তোমরা পেছনের সিটে উঠে পড়।'

'আমরাও যাব?'

'হ্যাঁ। যাবে।'

যেতে তো হবেই; কারণ, আরতির বুকে একটি অজ্ঞাত পরিচয়, সম্ভবত পরিত্যক্ত শিশু। পরিষ্কার পথ। গাড়ি ছুটছে। জমজমাট, রোদ ঝলমলে, সুন্দর একটি দিন। আরতি দেখছে, গভীর বিস্ময়ে দেখছে, সদ্যফোটা একটি মানুষের মুখ। এক সময় বলে উঠল, 'কি সুন্দর'।

বিরাট একটা গেট পেরিয়ে গাড়ি এসে থামল বিশাল এক প্রান্তরে। বৃহৎ কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রস্থলে। দূরত্ব বজায় রেখে সুন্দর সুন্দর বাড়ি। সাদা রং। সকালের রোদে ঝলমল, ঝলমল করছে। দেবুদা বললেন, 'এসে গেছি। নেমে পড়। এই হল আমার 'হৃদয়'। আমার বাবার নাম ছিল হৃদয়, আর আমার মায়ের নাম ধারা। হৃদয় ধারা। ফ্রি স্কুল, অরফ্যানেজ, হেলথ্ সেন্টার, ওলড এজ হোম। এই হল 'হৃদয় ধারা।' ওই দেখ দূরে, নীল পাহাড়। মাথার ওপর জৈনদের সাদা মন্দির। ভোরের প্রথম আলোয় সোনার চূড়া যখন ঝলমল করে ওঠে, নীচে দিয়ে বহে চলা ছোট্ট নদীতে যখন নীল আকাশ ঝাঁপিয়ে পড়ে, সাদা বকের ঝাঁক আকাশ ছেয়ে তখনই বুঝতে পারি পুরাণের গল্পের সত্য। জীবন সমুদ্রে সদা-সর্বদাই মন্থন চলছে। দুটি কলস-অমৃত আর গরল। মহা কোলাহল। মহাদেব কোথায়!

আলোক-ছায়ার বাঘছাল ওরে,
খসিয়া লুটায় বনে প্রান্তরে,
সিন্ধু কণায় ফুঁসিয়া ফেনায়
মরণ-চর।
নাচে শিব, নাচে রুদ্র নাচে রে
মহেশ্বর।
নাচে শিব, নাচে সুন্দর নাচে
রুদ্রকাল।

আরতির বুকের শিশুটি জেগে উঠেছে। অদ্ভুত একটা শব্দ করল, যা শিশুরাই করতে পারে। কচি হাত থুপুস হয়ে আরতির নাকের ডগায়। এই টুকটুকু দুধ সাদা আঙুল। বুকে মাথা গুঁজে কিছু একটা খুঁজছে।

আরতি আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে নিচু গলায় বলল, 'দুধ চাইছে।'

‘দাও।’

‘আমি কোথায় পাব? অসভ্য।’

আরতি কেমন অক্লেশে মা হয়ে গেল। মেয়েটির নাম রাখা হয়ে গেছে —অমৃতা। আমরা যখন ফিরে যাব আবার আমাদের অরণ্য পরিবেশে। সেখানেও একটা নদী আছে। নদীর পারে সুন্দর সবুজ পাহাড়। অরণ্যের আলো ছায়া। বনের পশুদের জন্য জায়গায় জায়গায় পাতা আছে ‘সল্ট লিক’। যখন খুশি এসে নুন চেটে যাবে। হাতির দল নামবে নদীতে। চাঁদের আলোর ঝিম ঝিম রাত। সাদা কদম, বক ফুল।

প্রথম সূর্যের আলোয় উলের ফুলোফুলো পোশাক পরে সবুজ লনে টলে টলে ছুটছে অমৃতা। চারপাশে লেংচে লেংচে ছোটাছুটি করছে সাদা সাদা খরগোশ। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে একদল রাজকীয় রাজহাঁস।

দেবুদা বললেন, ‘ওই জানলাটা খুলে দাও না। পাহাড় এসে ঘরে ঢুকবে। মন্দির চূড়ার আলো। অনেক আশা নিয়ে তোমাদের একটা কথা বলি, ওই চাকরিটা ছেড়ে এখানেই দুজনে লেগে যাও। শিবের কাজ। জীব সেবা, শিব সেবা। আমি আমেরিকা সামলাই, তোমরা এদিক সামলাও। আর আমার এই সুইট গোঁফ!’